মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৫, সংখ্যা-১১
ডিসেম্বর ২০১৬ ইং, রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হি., অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বাং

الأبرار
مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية
ربيع الاول ١٤٣٨ھ،دسمبر ٢٠١٦م

প্রতিষ্ঠাতা
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ
০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :
বিজয় ও খুশি উদ্‌যাপনে ইসলামী তরীকা............ ৪
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
‘ফাজায়েলে আমাল’ নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২৪.... ৫
দরসে ফিকহ
মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার................. ৮
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদুয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৩
ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
বন্ধুত্ব ও শত্রুতা..................................... ১৪
“সিরাতে মুস্তাকীম” বা সরলপথ :
সন্তানের আখলাক-চরিত্র রক্ষায় সচেষ্ট হোন.......... ১৬
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
মাযহাব অনুসরণ; তাৎপর্য ও বাস্তবতা-২ .... ১৮
মুফতি আবুল কাসেম নোমানী
মেয়েদের বিয়ের বয়স ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবাহ....... ২৪
মাওলানা কাসেম শরীফ
সচ্ছল জীবনযাপন ও মহানবী (সা.).................... ৩১
মুফতী আতীকুল্লাহ
একনজরে সীরাতে সায়্যিদুল মুরসালীন (সা.) ৪৫
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৬

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

আরাকানে মুসলিম নিধন : বিপর্যস্ত মানবতা

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার। এ দেশের সীমান্তঘেঁষে রয়েছে মিয়ানমারের আরাকান রাজ্য। রাজ্যটিতে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের বাস। রোহিঙ্গা বলেই যাদের পরিচয়। এ জাতিটি দীর্ঘকাল থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অত্যাচার-নিপীড়নে মজলুমিয়াতের সর্বশেষ বিন্দুতে উপনীত হয়, যা ইতিহাসের এক হৃদয়বিদারক অধ্যায়। কয়েক দশক ধরে জাতিসংঘের বিবেচনায়ও আমাদের এ গ্রহের সবচেয়ে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী হলো এই রোহিঙ্গারা। তাদের এ নাজুক পরিস্থিতি দেখে মেডিসিনস স্যান ফ্রন্টিয়ারস বলেছে, পৃথিবী থেকে বিলুপ্তপ্রায় আদিগোষ্ঠীর তালিকায় ভয়াবহ অবস্থানে রয়েছে রোহিঙ্গারা। রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার শুধু ভূলুণ্ঠিতই নয়, পদপৃষ্ঠ হয়েছে। নিপীড়নের নিত্যনতুন কৌশলের কাছে মানবতা লজ্জাবনত হয়েছে বারবার। ফলে আদম সন্তান হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করতে হলে যে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা আর অধিকার উপভোগ করতে হয়, তার কোনোটিই তাদের ভাগ্যে জোটে না। উপরন্তু নির্যাতনের মাত্রা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুধু বেড়েই চলছে তা নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ নিপীড়ন-নির্যাতন কল্পনাকেও হার মানায়।

রোহিঙ্গারা মূলত পশ্চিম মিয়ানমারের রাখাইন স্টেটের উত্তরাংশে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠী। এদের বেশির ভাগই মুসলমান। সংখ্যায় প্রায় ২০ লাখ রোহিঙ্গার বেশির ভাগ বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের পাশে পূর্ববর্তী আরাকান রাজ্যের তিনটি টাউনশিপে বাস করে। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও উগ্র রাখাইনদের সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ও এথনিক ক্লিনজিংয়ের শিকার হয়ে প্রায় ১০ লাখের মতো রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে। প্রাথমিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যীয় মুসলমান ও স্থানীয় আরাকানিদের সংমিশ্রণে রোহিঙ্গা জাতির উদ্ভব। পরবর্তী সময়ে চাটগাঁইয়া, রাখাইন, আরাকানি, বার্মিজ, বাঙালি, ভারতীয়, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষদের মিশ্রণে এ জাতি এয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

জাপানের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক Kei Nemote-এর মতে, রোহিঙ্গারা অষ্টম শতাব্দী থেকে রাখাইন রাজ্যে বাস করে আসছে। একজন ইসরায়েলি লেখক Moshe Yegar তাঁর 'Between Integration and Secession : The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand and Western Burma/Myanmar গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মুসলমানরা বার্মায় তাদের বসতি স্থাপনের প্রথম থেকেই রাজকীয় উপদেষ্টা, প্রশাসক, বন্দর কর্তৃপক্ষ, মেয়র, স্থানীয় চিকিৎসকসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে।

এই অঞ্চলের মুসলিম ঐতিহ্যের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সর্বপ্রথম হজরত আবু ওয়াক্কাস ইবনে ওয়াইব (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় (৬১৭-৬২৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে) আরাকান অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসেন। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের (রহ.)-এর শাসনামলে আরাকানের শাসকদের সঙ্গে আরবীয় মুসলমানদের যোগাযোগের বিষয়টিও প্রমাণিত। তবে দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আরব বণিক ও সুফি-সাধকদের ব্যাপক আগমনের ফলে আরাকান অঞ্চলে দ্রুত ইসলামের প্রচার হতে থাকে। তাই মিয়ানমারে মুসলমানদের ইতিহাস প্রায় ১২০০ বছরের পুরনো। গত সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে আরাকানের বৌদ্ধ রাজা বিদ্রোহীদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হলে তাঁর অনুরোধে গৌড়ের সুলতান কয়েক দফায় সেখানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ১৪৩২ সালে গৌড়ের সেনাপতি সিন্দি খান আরাকানের প্রাচীন রাজধানী ম্রোহংয়ে মসজিদ নির্মাণ করেন। ওই সময় থেকেই বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও স্বাধীন আরাকান রাজ্যের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে আরাকানে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং রাজসভায় বাংলা ভাষা বিশেষ স্থান লাভ করে। মহাকবি আলাওল, শাহ মুহম্মদ সগীর, মাগন ঠাকুরের মতো মধ্যযুগের বিখ্যাত কবিরা আরাকান রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

রোহিঙ্গারা সর্বপ্রথম জুলুমের শিকার হয় ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে। বার্মার খ্রিস্টান রাজা সে সময় আরাকান দখল করে নেন। এরপর রোহিঙ্গারা বড় ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় ১৯৪২ সালে, যখন জাপান বার্মা দখল করে নেয়। এসব নির্যাতনের সব মাত্রা ছাড়িয়ে রোহিঙ্গাদের ওপর ধারাবাহিক নিপীড়ন-নির্যাতন শুরু হয় ১৯৬২ সালে সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখলের পর থেকে। নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করে ১৯৮২ সালে মিয়ানমারের নতুন নাগরিকত্ব আইন প্রণয়নের ফলে। এ আইন কার্যকর হওয়ার পর বাতিল হয়ে যায় রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব। তখন থেকে মানুষ হিসেবে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকারও অচল হয়ে পড়ে।

১৯৪২ সালে জাপান বার্মা দখল করার পর স্থানীয় মগরা জাপানি সৈন্যদের সহায়তা নিয়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। ইতিহাসে এটি ১৯৪২ সালের গণহত্যা নামে খ্যাত। তখন লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং পাঁচ লক্ষাধিক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ব্রিটিশরা বার্মা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় এমন এক নীতি চাপিয়ে দিয়ে যায়, ফলে আরাকানের মুসলমানরা উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৪৭ সালের শাসনতান্ত্রিক নির্বাচনে ইংরেজদের দেওয়া 'সন্দেহভাজন নাগরিক' অভিধার কারণে মুসলমানদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। উ ন নামক শাসক আরাকান থেকে মুসলমানদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে মগ সেনাদের নিয়ে Burma Territorial Force গঠন করে নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। পরিকল্পিতভাবে মুসলিম বুদ্ধিজীবী, গ্রামপ্রধান, আলেম-ওলামা, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয় এবং মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আর সেখানে মগদের জন্য বসতি নির্মাণ করা হয়। ১৯৬২ সালের ২ মার্চ উ নকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলের পর নে উইন সংখ্যালঘুদের সব সাংবিধানিক অধিকার বাতিল করে দেন। ১৯৬৪ সালে রোহিঙ্গাদের সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয় এবং ১৯৬৫ সালের অক্টোবর থেকে Burma Broadcasting Service থেকে প্রচারিত রোহিঙ্গা ভাষার সব

অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই বার্মা সরকার ১৯৭৩ সালে উত্তর আরাকানে Major Aung Than operation ও ১৯৭৪ সালে Sabe operation নামে রোহিঙ্গা উচ্ছেদ অভিযান চালায়। ফলে হাজার হাজার রোহিঙ্গা জীবন রক্ষার্থে যুদ্ধবিধ্বস্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশে এসে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে। সেবারে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ় অবস্থান ও চরমপত্রের কারণে বার্মা সরকার বিতাড়িতদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তারপর তিন বছর যেতে না যেতেই সামরিক জান্তা 'কিং ড্রাগন অপারেশন' নামে রোহিঙ্গা উচ্ছেদে ভয়াবহ অভিযান শুরু করে। এরপর সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪, ১৯৮৫, ১৯৯০ এবং ২০১২ সালে রোহিঙ্গা উচ্ছেদে বর্বরতম অভিযান পরিচালনা করে বার্মার সামরিক জান্তা। শতাব্দীকাল ধরে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর চলা নির্মম নির্যাতনের বিষয়টি এখন সমগ্র বিশ্বের সামনে পরিষ্কার এবং এটাও স্পষ্ট যে শুধু মুসলমান হওয়ার কারণেই তাদের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানো হচ্ছে।

জেনারেল নে উইন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সব মিয়ানমার সরকারই মৌলিক মানবাধিকার বন্ধ রেখে রোহিঙ্গাদের সার্বিক বিনাশের খেলায় মত্ত। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রবিহীন ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে করা সব ধরনের অপরাধকে বৈধতা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের কোনো অনুচ্ছেদই সেখানে মানা হচ্ছে না। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা হলো–নাগরিকত্ব অস্বীকার, সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত ভ্রমণ ও চলাচল, নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত শিক্ষা, সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত কাজের অধিকার, জবরদস্তিমূলক শ্রম নিয়োগ, ভূমি অধিগ্রহণ, জবরদস্তিমূলক উচ্ছেদ, ঘরবাড়ি, অফিস, স্কুল, মসজিদ ইত্যাদি ধ্বংস, জাতিগত বৈষম্যমূলক আচরণ, নিয়ন্ত্রিত বিয়ে, সন্তান গ্রহণে বাধা ও জোরপূর্বক গর্ভনাশ, স্বেচ্ছাচারী কর আরোপ, গবাদি পশুসহ পরিবারের সদস্যদের জবরদস্তিমূলক জব্দ ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ, আইনবহির্ভূতভাবে হত্যা, রোহিঙ্গা নারী ও বয়স্কদের অবমাননা ও অমর্যাদা, যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণের প্রয়োগ, অভিবাসন ও নাগরিকত্ব কার্ড বাজেয়াপ্তকরণ, অভ্যন্তরীণ শরণার্থী ও রাষ্ট্রহীনতা, মুসলিম ঐতিহ্যসমৃদ্ধ স্থান ও প্রতীকের ধ্বংস কিংবা পরিবর্তন ইত্যাদি।

আমাদের কথা হলো, 'অহিংসা পরম ধর্ম', 'জীব হত্যা মহাপাপ'–এসব নীতিকথা বলেছেন গৌতম বুদ্ধ। মানবতাবাদী হিসেবে জগৎসংসারে তিনি বেশ খ্যাতিও কুড়িয়েছেন। প্রবর্তন করেছেন বৌদ্ধ ধর্মের। এ ধর্মের অনুসরণ করে মিয়ানমারের বেশির ভাগ মানুষ। মিয়ানমার সরকারও এই ধর্মের অনুসারী। কিন্তু বাস্তবে আমরা এসব কী দেখছি? এটা কোন ধরনের অহিংসার নমুনা! তাহলে কি মিয়ানমারের লোকদের কাছে মুসলমানরা 'জীব'-এর সংজ্ঞায় পড়ে না? 'জীব হত্যা মহাপাপ'-এর অমর বাণীর পতাকাবাহীদের হাতে বছরের পর বছর ধরে খুন হচ্ছে হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান। তাদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে আরাকানের সবুজ ঘাস, রক্তে জমাট হয়েছে মাটি। নারী-পুরুষের আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে উঠেছে মিয়ানমারের আকাশ-বাতাস।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া পরিচালক ব্র্যাড অ্যাডামস বলছেন, নতুন প্রকাশিত ছবিতে ব্যাপক হারে ধ্বংসযজ্ঞ দেখা যাচ্ছে, যা আগের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন মিয়ানমারের 'গণতান্ত্রিক' সরকার মুসলিম নিধনের এ কর্মযজ্ঞকে 'ক্লিয়ারেন্স অপারেশন' হিসেবে অভিহিত করছে।

জাতিসংঘসহ অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থা রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে রোহিঙ্গারা পৃথিবীর সবচেয়ে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে কিই বা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই ধ্বংসযজ্ঞের একটা স্থায়ী সমাধান হওয়া আবশ্যক। উন্নত বিশ্ব এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে সচেষ্ট হলে এর একটা সমাধান হতে পারে নিশ্চয়ই। আরাকানি মুসলমানদের বর্তমান বিপর্যয় মুহূর্তে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্ব অনেকাংশেই বেড়ে যায়। তারা চাইলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিষয়গুলোর সমাধান করতে পারে। এরূপ করা আবশ্যক এবং কতর্ব্যও বটে। পুরো দুনিয়ার মুসলমানদের উচিত বিশেষ করে আরাকানের মুসলমানদের মুক্তির লক্ষ্যে ইজতিমায়ী, এনফেরাদী, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিকভাবে দু'আয় মশগুল হওয়া। মুসলিম উম্মাহের মুক্তির জন্য বিশেষ বিশেষ আমল করে কায়মনোবাক্যে দু'আ করা। প্রতিবেশী দেশসমূহের জনগণ সরকার অনুমোদিত পন্থায় তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সারকার, মানবাধিকার সংস্থা এবং ত্রাণকর্তাদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৭/১১/২০১৬ ইং

বেফাক মহাসচিবের ইন্তিকালে মুফতী আরশাদ রহমানীর শোক

বেফাকুল মাদারিস বাংলাদেশের মহান ত্যাগী মহাসচিব হযরত মাওলানা আব্দুল জব্বার সাহেবের ইন্তিকালে তানযীমুল মাদারিল কওমিয়্যা বাংলাদেশের সভাপতি, বগুড়া জামিল মাদরাসা ও মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশের পরিচালক, মাসিক আল আবরারের প্রধান সম্পাদক হযরত আল্লামা মুফতী আরশাদ রহমানী সাহেব এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

শোকবার্তায় তিনি বলেন, বেফাকের দীর্ঘদিনের আত্মনিবেদিত এই মহান ব্যক্তি যুগ যুগ ধরে বেফাকসহ কওমী মাদরাসার বিভিন্ন বিষয়ে অবদান রেখে গেছেন। বিশেষ করে বেফাকে তাঁর দীর্ঘ দিনের খেদমাত এবং অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর ইন্তিকালে কওমী মাদরাসা আত্মোৎসর্গিত এক ব্যক্তিত্বকে হারালো।

তিনি আল্লাহর কাছে তাঁর মাগফিরাত এবং দরজাত বুলন্দ করার দু'আ করেন। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজন এবং ভক্ত অনুরক্তদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং তাদেরকে ধৈর্যের তাওফীক দান করার জন্যও আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেন।

উল্লেখ্য, তাঁর ইন্তিকালের খবর পাওয়া মাত্রই মুফতী আরশাদ রহমানী সাহেব নিজ পরিচালনাধীন মাদরাসাসমূহে বিশেষ দু'আ ও তাহলীলের ব্যবস্থা করেন।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বিজয় ও খুশি উদ্‌যাপনে ইসলামী তরীকা

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় * এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন * তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। (সূরা নাসার)

এ ব্যাপারে সকলে একমত যে প্রথম আয়াতে বিজয় বলে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে, তবে সূরাটি বিজয়ের পূর্বে নাযিল হয়েছে, না পরে–এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। اذا جـــاء ভাষাদৃষ্টে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বাহ্যত মনে হয়। রূহুল মাআনীতে এর অনুকূলে একটি রেওয়ায়াতও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খায়বার বিজয় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে, তা সর্বজনবিদিত। রূহুল মাআনীতে হযরত কাতাদা (রা.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল (সা.) দুই বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হজে নাযিল হয়েছে সেগুলোর মর্মার্থ এরূপ হতে পারে যে এ স্থলে রাসূল (সা.) সূরাটি পাঠ করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারণা করেছে যে এটা এক্ষুনি নাযিল হয়েছে।

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে এ সূরায় রাসূলে করীম (সা.)-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব আপনি তাসবীহ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল (রহ.)-এর রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামের এক সমাবেশে সূরাটি তেলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.)ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন। বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাই রেওয়ায়াত করেছেন। তাতে আরো আছে যে হযরত উমর (রা.) এ কথা শুনে বললেন, এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি। (কুরতুবী)

رأيت الناس : মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রিসালাত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কোরাইশদের ভয়ে অথবা কোনো ইতস্ততার কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। মক্কা বিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সে মতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়েমেন থেকে সাত শ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পথিমধ্যে আযান দিতে দিতে ও কোরআন পাঠ করতে করতে মদীনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে বেশি পরিমাণ তাসবীহ ও ইস্তেগফার করা উচিত :

فسبح بحمد ربك واستغفره

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক নামাযের পর এই দু'আ পাঠ করতেন :

سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفرلى

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তিনি উঠাবসা, চলাফেরা অথবা সর্বাবস্থায় এই দু'আ পাঠ করতেন।

سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه

তিনি বলেন, আমাকে এর আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর প্রমাণস্বরূপ সূরাটি তেলাওয়াত করতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে ইবাদতে মনোনিবেশ করেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে যায়। (কুরতুবী)

বিজয়ানন্দ আমরা কিভাবে উদ্‌যাপন করব?

স্বাধীনতা, সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আল্লাহপ্রদত্ত অকল্পনীয় একটি নেয়ামত। যারা পরাধীন তারাই বোঝে স্বাধীনতার স্বাদ কী? পরাধীনতার শৃঙ্খল কত অসহনীয়। তাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, আপন রাষ্ট্রের মোহাব্বত ও ভালোবাসা ইসলামে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (সা.) নিজ জন্মস্থান মক্কা মুআজ্জামা এবং হিজরতের পর নিজ বাসস্থান মদীনা মুনাওয়ারাকে কী পরিমাণ ভালোবাসতেন তার নমুনা হাদীস শরীফে অনেকভাবে পাওয়া যায়। তাতে বোঝা যায়, দেশপ্রেম রাসূল (সা.)-এর আদর্শ। দেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যাপারেও ইসলামের কড়া নির্দেশনা রয়েছে। স্বাধীনতার বার্তায় মানুষ খুশি হবে, আনন্দিত হবে–তা স্বভাবজাত বিষয়। এরূপ খুশি উদ্‌যাপনেও ইসলামের দিকনির্দেশনা রয়েছে।

আলোচ্য সূরার আলোকেই উলামায়ে কেরাম বিজয়, স্বাধীনতাসহ বিভিন্ন নিয়ামতের খুশি উদ্‌যাপনের নিয়ম ও পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন, এরূপ খুশি ও বিজয়ের মুহূর্তে 'আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'

এখানে তিনটি কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে– ১. আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করা। ২. আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করা ও ৩. ভুল-ত্রুটির ক্ষমা চাওয়া।

এরূপ রাসূল (সা.) নিজ জন্মদিন সোমবার রোযা রাখার কথা এসেছে বিভিন্ন হাদীসে।

এসব নির্দেশনা থেকে মুসলমানগণ বিজয়ানন্দ বা যেকোনো খুশির দিন পালনে ইসলামের নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারে। এরূপ কর্মসূচিতেই মূলত মুসলিম উম্মাহের যাবতীয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২৪

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে যিকির খাতেমা তথা পরিশিষ্ট :

হাদীস নং-০১

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " :يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرُ خِصَالٍ :أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ، وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার আপন চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-কে বললেন, হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে একটি দান, একটি বখশিশ দেব? একটি জিনিস বলে দেব? আপনাকে দশটি জিনিসের মালিক বানাব? যখন আপনি এ কাজটি করবেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের গোনাহ, নতুন ও পুরাতন গোনাহ, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত গোনাহ, সগীরা ও কবীরা গোনাহ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ সব মাফ করে দেবেন। সেই কাজটি হলো এই যে চার রাক'আত নফল নামায (সালাতুত তাসবীহের নিয়্যাতে) পড়ুন। প্রত্যেক রাক'আতে আল-হামদু পড়ে সূরা মেলানোর পর রুকুতে যাওয়ার আগে "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবার" ১৫ বার পড়ুন। অতঃপর যখন রুকু করবেন তাতে ১০ বার পড়ুন। অতঃপর যখন রুকু হতে দাঁড়াবেন তখন ১০ বার পড়ুন। অতঃপর সিজদা করুন এবং ১০ বার পড়ুন। অতঃপর সিজদা হতে বসে ১০ বার পড়ুন, যখন দ্বিতীয় সিজদায় যাবেন তখন তাতে ১০ বার পড়ুন। তারপর যখন দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠবেন (তখন দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য) দাঁড়ানোর পূর্বে বসে ১০ বার পড়ুন। সব মিলে ৭৫ বার হলো। এরূপ প্রতি রাক'আতে ৭৫ বার হবে। যদি সম্ভব হয় তবে প্রতিদিন একবার এই নামায পড়ে নেবেন। যদি না হয় তবে জুমু'আর দিনে একবার পড়বেন। তাও যদি না হয় তবে মাসে একবার পড়বেন। তাও যদি না হয় তবে প্রতি বছর একবার পড়বেন। তাও যদি না হয় তবে সারা জীবনে একবার হলেও এই নামায অবশ্যই পড়বেন।

(আবু দাউদ শরীফ ২/৬৭ হা. ১৬৯৭, ইবনে মাযাহ শরীফ ২/১৫৮ হা. ১৩৭৮, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪৬৩ হা. ১১৯২, সহীহে ইবনে খুযাইমা ২/২২৩ হা. ১২১৬, সুনানে কুবরা [বায়হাকী] ৩/৭৩ হা. ৪৯১৬)

হাদীসটির মান : হাসান

হাদীস নং-০২

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْأُبُلِّيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ :حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يَرَوْنَ أَنَّهُ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ :قَالَ لِى النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْتِنِى غَدًا أَحْبُوكَ، وَأُثِيبُكَ، وَأُعْطِيكَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِينِى عَطِيَّةً، قَالَ :إِذَا زَالَ النَّهَارُ، فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ :ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ يَعْنِى مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَوِ جَالِسًا، وَلَا تَقُمْ حَتَّى تُسَبِّحَ عَشْرًا، وَتَحْمَدَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرَ عَشْرًا، وَتُهَلِّلَ عَشْرًا، ثُمَّ تَصْنَعَ ذَلِكَ فِى الأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ، قَالَ :فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ، قُلْتُ :فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ؟ قَالَ صَلِّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،

এক সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, তুমি আগামীকাল এসো আমি তোমাকে একটি বখশিশ দেব, একটি জিনিস দেব, একটি বস্তু দান করব। সাহাবী (রা.) বলেন, এই কথা দ্বারা আমার মনে হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে কোনো পার্থিব সম্পদ দান করবেন। আমি পরদিন এসে হাজির হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, দুপুরে যখন সূর্য হেলে যায় তখন চার রাক'আত নামায আদায় করবে। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত নিয়মে পড়তে বললেন। এও বললেন যে তুমি যদি সারা দুনিয়ার মানুষের চেয়ে বেশি গোনাহগার হও তবু তোমার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। আমি আরজ করলাম, যদি ওই সময়ে পড়তে না পারি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, দিনে অথবা রাতে যেকোনো সময় পারো পড়ে নিয়ো।

(আবু দাউদ শরীফ ২/৬৮ হা. ১২৭৮, তিরমিযী শরীফ ২/৩৪৭ হা. ৪৮১)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-০৩

حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ إِمْلاءً مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ بِمِصْرَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ كَامِلٍ، ثنا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :وَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ إِلَى بِلادِ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ اعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ :أَلَا أُهَبُ لَكَ، أَلَا أُبَشِّرُكَ، أَلَا أُمْنَحُكَ، أَلَا أُتْحِفُكَ؟ قَالَ :نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ .قَالَ " :تُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপন চাচাত ভাই হযরত জাফর (রা.)-কে হাবশায় পাঠিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন এবং কপালে চুম্বন করলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন, আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব, একটি সুসংবাদ শোনাব, একটি বখশিশ দেব, একটি উপহার দেব। হযরত জাফর (রা.) বললেন, অবশ্যই দেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, চার রাক'আত নামায পড়ো। অতঃপর ওপরে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী বললেন। এই হাদীসে উক্ত চার কালেমার সাথে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াত ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীমও পড়ার কথা এসেছে।

(মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৩১৯ হা. ১১৯৬)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-০৪

عن العباس بن المطلب قال قال لى رسول الله ﷺ الا اهب لك الا اعطيك الا امنحك فظننت انه يعطينى من الدنيا شيئا لم يعطه احدا من قبلى قال اربع ركعات---

হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমি তোমাকে একটি বখশিশ দেব, একটি উপহার দেব, একটি জিনিস দান করব? হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি মনে করলাম, দুনিয়ার এমন কোনো জিনিস তিনি আমাকে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন, যা আর কাউকেও দেননি। অতঃপর তিনি আমাকে চার রাক'আত নামায শেখালেন। (যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে। এতে এ কথাও বলেছেন যে যখন আত্তাহিয়্যাতুতে বসবে তখন প্রথমে এই তাসবীগুলো পড়ে নেবে পরে আত্তাহিয়্যাতু পড়বে)

(আল ইতহাফ [যুবাইদী] ৩/৭৮৯)

হাদীসটির মান : হাসান

হাদীস নং-০৫

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَنِ الصَّلاةِ الَّتِى يُسَبَّحُ فِيهَا؟ فَقَالَ " :يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُولُ :سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً :سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ، وَيَقْرَأُ : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ، وَفَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَسُورَةً، ثُمَّ يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ :سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ، فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ، فَيَقُولُهَا عَشْرًا، يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى هَذَا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ تَسْبِيحَةً فِى كُلِّ رَكْعَةٍ، يَبْدَأُ

فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسَ عَشْرَةَ تَسْبِيحَةً، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا، فَإِنْ صَلَّى لَيْلًا فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ صَلَّى نَهَارًا فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ "قَالَ أَبُو وَهْبٍ :وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ :يَبْدَأُ فِي الرُّكُوعِ بِسُبْحَانَ رَبِيَ العَظِيمِ، وَفِي السُّجُودِ بِسُبْحَانَ رَبِيَ الأَعْلَى ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَبِّحُ التَّسْبِيحَاتِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ :وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ "قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ :إِنْ سَهَا فِيهَا يُسَبِّحُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَشْرًا عَشْرًا؟ قَالَ :لَا، إِنَّمَا هِيَ ثَلَاثُ مِائَةِ تَسْبِيحَةٍ۔

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) ও অন্যান্য বহু উলামায়ে কেরাম হতে এই নামাযের ফজীলত নকল করা হয়েছে এবং তাদের নিকট হতে এই তরীকা বর্ণিত হয়েছে, ছানা পড়ার পর ১৫ বার এই কালেমাগুলো পড়বে। অতঃপর আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ, আল-হামদু সূরা ও অন্য কোনো সূরা মেলানোর পর রুকুতে যাওয়ার আগে ১০ বার পড়বে। অতঃপর রুকুতে ১০ বার পড়বে। রুকু হতে উঠে ১০ বার পড়বে। দুই সিজদায় ১০ বার ১০ বার পড়বে। দুই সিজদার মাঝখানে বসে ১০ বার পড়বে। এভাবে ৭৫ বার হয়ে গেল। রুকুতে গিয়ে প্রথমে সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম এবং সিজদায় গিয়ে প্রথমে সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা পড়বে। এরপর উক্ত কালেমাগুলো পড়বে। রাসূল (সা.) থেকে এই নিয়মে বর্ণনা করা হয়েছে।

(তিরমিযী শরীফ ২/৩৪৮ হা. ৪৮১, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩২০ হা. ১১৯৭)

হাদীসটির মান : হাসান

(ফজায়েলে যিকির সমাপ্ত)

আলহামদু লিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ। এই পর্যন্ত ফাজায়েলে আমালের একটি কিতাব ফাজায়েলে যিকিরের প্রত্যেকটি হাদীসের তাখরীজ এবং তাহকীক সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হলো। মূলত ফাজায়েলে আমালে ফাজায়েলে যিকিরটিই বড়। যেহেতু এতে যিকিরের ফজীলত বর্ণিত হয়েছে সেহেতু কতিপয় যিকিরবিরোধী লোক এই কিতাবটিতে ছিদ্রান্বেষণের কাজে লিপ্ত হয় ব্যাপকভাবে। এরা আল্লাহর যিকিরের দুশমন। অথচ ইসলামের সব ইবাদতে আল্লাহর যিকিরই উদ্দেশ্য। শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (রহ.) মানুষকে আল্লাহর যিকিরের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য অসংখ্যা হাদীস, তাফসীর এবং সলফদের কিতাব থেকে যিকিরসংক্রান্ত ফাজায়েলের হাদীস সংকলন করেছেন। এই কিতাব প্রণয়নে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) এত কিতাব অধ্যয়ন করেছেন যে বর্তমান জামানার কথিত হাদীস বিশারদগণ যারা ফাজায়েলে আমাল নিয়ে সমালোচনার ঝড় তোলার অপপ্রয়াসে লিপ্ত তারা ওই কিতাব পড়ার যোগ্যতাও রাখে না।

হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর নিয়ম হলো যে বিষয় তিনি লিখতে আরম্ভ করেন উক্ত বিষয়ে প্রথমে কোরআনের আয়াত উল্লেখ করেন। তারপর হাদীস সংকলন করেন। আবার একটি হাদীস বর্ণনা করার পর তার সমর্থনে আরো বহু হাদীস উল্লেখ করেন। এক হাদীসের সমর্থনে আরো হাদীস আনার ক্ষেত্রে অনেক সময় সনদ বিবেচনায় জঈফ হাদীসও তিনি উল্লেখ করেছেন। হাদীস বর্ণনায় হাদীসের সকল ইমামের প্রায় একই রীতি ছিল।

এই পর্যন্ত আমরা ফাজায়েলে যিকিরের যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি তার মধ্যে বলতে গেলে প্রায় হাদীস সহীহ এবং হাসান পর্যায়ের। কিছু কিছু হাদীস সনদের বিবেচনায় জঈফ হলেও সেটা হয়তো উল্লিখিত মূল হাদীসের সমর্থনে শক্তিশালী অথবা ফাজায়েলের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত। সে কারণে এখানে হাদীসের হুকুম লাগাতে গিয়ে অনেক হাদীসের বেলায় 'গ্রহণযোগ্য' লেখা হয়েছে। সুতরাং এসব হাদীসের কোনো একটিও এমন নেই যে, যেগুলো দুর্বল বা মওজু বলে স্বয়ং ফাজায়েলে আমালকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে। হাদীসগুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত আকারে যে তাখরীজ ও তাহকীক এই লেখায় প্রকাশিত হয়েছে তার বিস্তারিত তাখরীজ, তাহকীক, রাবীদের বিস্তারিত দেরাসাসম্বলিত দস্তাবেজ মারকাজুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরায় সংরক্ষিত আছে।

ফাজায়েলে আমাল কিতাবটি তা'লীম, তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) এবং দাওয়াত–এই তিন বিষয়ের সমন্বিত সঠিক চিন্তাধারা সৃষ্টিকারী এক অনন্য কিতাব। আবার বিভিন্ন গোমরাহীর ওষুধ ও প্রতিকারও তাতে সন্নিবিষ্ট। বাস্তবতা হলো, কিতাবটি যারাই পাঠ করেন তাঁদের মাঝে ইসলামের সঠিক ধারণা এবং সুন্নাতে নববী মোতাবেক একটা চিন্তাধারা এবং আমলের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ক্রমে হেদায়াতের আলোকে জীবন গড়তে সক্ষম হন তাঁরা।

মূলত কিতাবটির ব্যাপারে বিভিন্ন বাতিল চিন্তাধারাপুষ্ট লোকদের মাথাব্যথা সৃষ্টি হওয়া, এই কিতাব সম্পর্কে ডাহা মিথ্যা-বানোয়াট, অভিযোগ-অনুযোগ উত্থাপন করাসহ কিতাবটি সম্পর্কে কিছু চিহ্নিত মহলের সর্বপ্রকার অপপ্রচারের কারণ এটিই। হক্ব কথায় আহাম্মক বেজার।

আমরা আগামী সংখ্যা থেকে ফাজায়েলে নামাযের হাদীসগুলো সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করব ইনশাআল্লাহ। ধৈর্য ধারণ করে সাথে থাকার অনুরোধ রইল।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দরসে ফিক্বহ

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার

মুফতী শাহেদ রহমানী

ইসলাম এমন জীবনব্যবস্থা, একমাত্র যার বিশ্ব সমাজ গড়ে তোলার মতো ঔদার্য আছে। এ ধর্ম মতে, একই রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মাঝে সামাজিকতার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য নেই। গোশত ছাড়া অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে আহলে কিতাব ও অন্যান্য কাফেরের মাঝে কোনো তারতম্য নেই। সবাই একে অন্যের খাবার বৈধ পন্থায় গ্রহণ করতে পারবে। আর গোশতের ক্ষেত্রেও আহলে কিতাব ও মুসলমানদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আহলে কিতাবের জবাইকৃত হালাল প্রাণী মুসলমানদের জন্য বৈধ।

ইসলাম শুধু অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতাই দেয়নি, তাদের সঙ্গে সামাজিক অংশীদারি, সৌজন্যবোধ ও মেলামেশার সুযোগ দিয়েছে। এমনকি আহলে কিতাবের রমণীদের বিবাহ করা বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম যেহেতু পৃথক একটি ধর্ম। তাই আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতার স্তর ও সহযোগিতার ধরনের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রাখা হয়েছে। ইসলাম অমুসলিমদের সব ক্ষেত্রে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। তাদের যথাযথ সম্মান দিয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপ–

অমুসলিমদের সঙ্গে উঠাবসা

অমুসলিমদের সঙ্গে উঠাবসা করতে ইসলাম নিষেধ করে না। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ও উঠাবসা করা বৈধ। তবে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন করা যাবে না। এমনকি তাদের মসজিদে বসারও অনুমতি আছে।

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَزَلُوا قُبَّةً كَانَتْ فِى مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاَةَ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَضَرَتِ الصَّلاَةَ وَهَؤُلاَءِ قَوْمٌ كُفَّارٌ وَهُمْ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :إِنَّ الأَرْضَ لاَ تَنْجُسُ، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

হযরত হাসান বলেন, যখন সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি রাসূল (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়, তখন তারা মসজিদের শেষ প্রান্তে অবস্থিত গম্বুজের কাছে অবস্থান করে। যখন নামাযের সময় হলো, দলের একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের সময় হয়েছে অথচ এরা একদল অমুসলিম মসজিদে আছে। তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'অমুসলিমদের কারণে জমিন নাপাক হয় না।' (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস : ৮৫৭৬)

অমুসলিমদের প্রতি জুলুম করা নিষিদ্ধ

নবী করীম (সা.) কারো ওপর জুলুম করতে নিষেধ করেছেন, যদিও মজলুম অমুসলিম হয় :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ

তিনি বলেন, 'তোমরা মজলুমের বদদু'আ থেকে বেঁচে থেকো, যদিও সে কাফের হয়। তার মাঝখানে আর আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা নেই (অর্থাৎ তার বদদু'আ দ্রুত কবুল হয়ে যায়)।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১২৫৭৭)

অমুসলিমদের সঙ্গে ভালো কথাবার্তা

তাদের সঙ্গে শালীন কথাবার্তা বলতে হবে। আচার-আচরণে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে এসেছে :

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنِ سَلامٍ :أَنَّ اللهَ لَمَا أَرَادَ هَدْىَ زَيْدِ بنِ سَعْيَةَ قَالَ زَيْدٌ لَمْ يَبْقَ شىء مِنْ عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِى وَجْهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلَّا اثْنَتَيْنِ لَمْ أُخْبَرْهُمَا مِنْهُ: يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، ولا يزيده شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا .قَالَ فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ فَأَعْرِفَ حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ، فَذَكَرَ قِصَّةَ إِسْلاَمِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مالاً فى ثمرة، قَالَ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ وَهُوَ فِى جِنَازَةٍ مَعَ أَصْحَابِهِ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، وَقُلْتُ :يَا مُحَمَّدُ أَلَا تَقْضِينِى حَقِّى؟ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُكُمْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَمُطُلٌّ، قَالَ فَنَظَرَ إِلَىَّ عُمَرُ وَعَيْنَاهُ يَدُورَانِ فِى وَجْهِهِ كَالْفَلَكِ الْمُسْتَدِيرِ. ثُمَّ قَالَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَتَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْمَعُ، وَتَفْعَلُ مَا أَرَى؟ فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَوْلَا مَا

أحاذر لومه لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ فِي سُكُونٍ وَتُؤَدَةٍ وَتَبَسُّمٍ .... ثُمَّ قَالَ " :أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ،

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালমা (রা.) বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা যায়েদ ইবনে সাই'য়াকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দিলেন, যায়েদ বললেন, নবুওয়তের সব নিদর্শন আমি মহানবী (সা.)-এর চেহারায় অবলোকন করেছি; কিন্তু দুটি নিদর্শন এখনো আমি অনুভব করতে পারিনি। এক. তাঁর ধৈর্য তাঁর অজ্ঞতার ওপর প্রাধান্য লাভ করবে। দুই. অজ্ঞতা তাঁর ধৈর্যকে আরো বাড়িয়ে দেবে। সাহাবী বলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করি, যাতে তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারি। একবার আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এলাম। আমি তাঁর জামা ও চাদর ধরলাম। তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে এক জানাযায় ছিলেন। আমি তাঁর দিকে রুক্ষ চেহারায় তাকালাম এবং বললাম, হে মুহাম্মদ! তুমি কি আমার ঋণ আদায় করবে না? আল্লাহর কসম! তোমরা বনি মুত্তালিব টালবাহানার লোক। এ সময় ওমর (রা.) আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চেহারায় চক্ষু ঘোরাফেরা করছে ঘুরন্ত নক্ষত্রের মতো, অর্থাৎ রাগে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে আছেন। ওমর (রা.) আমাকে বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমন! তুমি কি রাসূলকে এমন কথা বলছ, যা আমি শুনছি? তুমি কি এমন কিছু করছ, যা আমি দেখছি? আল্লাহর কসম! মহানবী (সা.) আমাকে বকা না দিলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।' রাসূল (সা.) তখন ওমরের দিকে শান্ত, ভদ্র ও মুচকি হেসে তাকালেন। তারপর বললেন, 'হে ওমর! আমি ও সে তার চেয়ে উত্তম আচরণের মুখাপেক্ষী। তুমি আমাকে সুন্দরভাবে ঋণ আদায় করতে বলতে পারতে। আর তাঁকে সুন্দরভাবে ঋণ উসুল করার জন্য বলতে পারতে। হে ওমর! তুমি যাও ও তাঁর হক্ব আদায় করো এবং তাকে আরো অতিরিক্ত ২০ 'সা' ফল দাও।' এটি দেখে যায়েদ ইবনে সা'ইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং রাসূলের সঙ্গে পরবর্তী সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাবুক যুদ্ধের বছর তিনি ইন্তেকাল করেন।' (ইবনে কাসীর, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮০)

অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া

অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়াও সুন্নাত। নবী করীম (সা.) অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন এবং তাদের ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তাদের সেবা করতেন।

عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইহুদি বালক নবী করীম (সা.)-এর খেদমত করত। যখন সে অসুস্থ হলো, তখন মহানবী (সা.) তাকে দেখতে গেলেন, তার মাথার দিকে বসলেন আর তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো! তখন সে তার পিতার দিকে দেখল। পিতা বললেন, তুমি আবুল কাসেমের অনুসরণ করো, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী (সা.) এই বলে বের হলেন, আল্লাহর শোকর, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।' (বুখারী শরীফ, হাদীস : ১২৫৬)

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনুল মুসায়্যিব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে এল নবী (সা.) তাঁর দরবারে গেলেন। তাঁর কাছে আবু জাহল বসা ছিল। তখন তিনি বললেন, হে চাচা! কালেমা পড়ো, আমি তা দ্বারা আল্লাহর দরবারে আবেদন করব। তখন আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বলল, হে আবু তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হচ্ছ? তারা তাঁকে বারবার তা স্মরণ করিয়ে দিল। তাই আবু তালিব শেষ কথা বলল, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মে ইন্তেকাল করছি। তখন মহানবী (সা.) বললেন, আমি আপনার জন্য পাপ ক্ষমা চাইব নিষেধাজ্ঞা আসা পর্যন্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাজিল হলো–'নবী ও ঈমানদারের উচিত নয়, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা চাওয়া, যদিও তারা আত্মীয়স্বজন হয়।' (বুখারী, হাদীস : ৩৮৮৪)

এভাবে তিনি মৃত্যুর সময় তাঁদের দেখতে গিয়ে ঈমানের দাওয়াত দিতেন এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

অমুসলিম মৃতদের সম্মান করা

অমুসলিম জীবিতের যেমন হক্ব রয়েছে, তেমনি মৃতেরও হক্ব রয়েছে। তাদের দাফনে সহযোগিতা করতে হবে এবং তাদের জানাযাকেও সম্মান দিতে হবে। কেননা তারা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত।

ان عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا.

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণিত, সাহল ইবনে হুনাইফ ও কায়েস ইবনে সাদ কাদেসিয়াতে বসা ছিলেন। তখন তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তাঁরা দুজন দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদের বলা হলো, ইনি হলো কাফের। তাঁরা বললেন, মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে একসময় এক জানাযা নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির জানাযা। তখন তিনি বললেন, এটা কি প্রাণী নয় (মানব নয়)?' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১২১৩)

অমুসলিমদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ

যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে জিম্মি হিসেবে (মুসলিম রাষ্ট্রের আইন মেনে) বসবাস করে, তাদের হত্যা করা যাবে না। তেমনি যারা ভিসা নিয়ে আমাদের দেশে আসে, তাদের হত্যা করা যাবে না। তাদের জানমালের নিরাপত্তা মুসলমানদের মতোই অপরিহার্য। ইমাম বায়হাকি (রহ.) সুনানে কুবরা নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ :أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ :فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَجَاءَ أَخُوهُ فَقَالَ :إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ، قَالَ :فَلَعَلَّهُمْ هَدَّدُوكَ وَفَرَقُوكَ وَفَزَعُوكَ، قَالَ :لَا، وَلَكِنْ قَتْلُهُ لَا يَرُدُّ عَلَيَّ أَخِي، وَعَوَّضُونِي فَرَضِيتُ .قَالَ ":أَنْتَ أَعْلَمُ مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا، وَدِيَتُهُ كَدِيَتِنَا.

হযরত আবু জানুব আসাদি (রহ.) থেকে বর্ণিত, আলী (রা.)-এর দরবারে এক মুসলিমকে হাজির করা হয়, যে একজন অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করেছে। এ হত্যার প্রমাণও পাওয়া গেছে। তখন তিনি তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময় মৃত ব্যক্তির ভাই এল এবং বলল, আমি তাকে ক্ষমা করছি। তখন তিনি বললেন, হয়তো তার পরিবার তোমাকে ধমক দিয়েছে, ভীতি প্রদর্শন করেছে, হুমকি দিয়েছে। সে বলল, না। কিন্তু তাকে হত্যা করলে আমার ভাই ফিরে আসবে না। আর তারা আমাকে 'দিয়াত' (রক্তপণ) দিয়েছে। তাই আমি রাজি হয়েছি। আলী (রা.) বললেন, 'তুমি ভালো করেই জানো, যেসব অমুসলিম আমাদের রাষ্ট্রে নাগরিক হিসেবে থাকবে, তাদের জীবন আমাদের মতো, তাদের রক্তপণ আমাদের রক্তপণের মতো।' (বায়হাকী, হাদীস : ১৫৯৩৪)

অন্য হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুগন্ধি ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (বুখারী, হাদীস : ৩১৬৬)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

হযরত আবু বাকারা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২০৬৪৮)

অমুসলিম বন্দিদের সঙ্গে সদাচার

কোনো কারণে যদি তাদের কোনো লোক বন্দি হিসেবে মুসলমানদের অধীনে আসে তখন তাদের বন্দিদের সঙ্গে সদাচার করত হবে। তাদের আহার করাতেও সদকার পুণ্য রয়েছে। বরং যেকোনো প্রাণীকে আহার করাতে সদকা রয়েছে। কারণ প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণ মর্যাদাবান। তাই তাদের অনর্থক নষ্ট করা নিষেধ।

কাতাদাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত,

عَنْ قَتَادَةَ،قَوْلُهُ :(وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) قَالَ:لَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالْأَسْرَاءِ أَنْ يَحْسُنَ إِلَيْهِمْ، وَإِنَّ أَسْرَاهُمْ يَوْمَئِذٍ لَأَهْلُ الشِّرْكِ.

'তারা আহার করায় আল্লাহর মুহাব্বাতে মিসকিন ইয়াতিম ও বন্দিদের। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে বন্দিদের সঙ্গে ভালো আচরণ করার জন্য বলেছেন। আর তখনকার বন্দিরা মুশরিকই ছিল।' (তাফসীরে তাবারী : ২৪/৯৭)

বন্দিদের সঙ্গে ভালো আচরণের একটি দৃষ্টান্ত বুখারী শরীফে এভাবে এসেছে,

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ

دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَىَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَىَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَىَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلاَدِ إِلَىَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِى وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوْتَ قَالَ : لاَ وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ وَاللَّهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) নজদের দিকে অশ্বারোহী একটি দল পাঠালেন, তখন বনী হানীফার ছুমামা ইবনে উছাল নামক ব্যক্তিকে তাঁরা আটক করলেন। তাঁরা তাকে মসজিদের একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। নবী (সা.) তার কাছে গেলেন এবং বললেন, তোমার কী ধারণা, হে ছুমামা? তখন সে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার ভালো ধারণা রয়েছে। যদি আপনি হত্যা করেন, তাহলে একজন হত্যার উপযুক্তকে হত্যা করবেন। আর যদি ইহসান করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে মুক্তি দেবেন। যদি আপনি মাল চান, তাহলে যা ইচ্ছা চান। এভাবে দ্বিতীয় দিন অতিক্রম হলো। মহানবী (সা.) তাকে বললেন, তোমার কী ধারণা ছুমামা! তখন সে বলল, কথা তো আমি আগেই বলেছি, যদি মুক্তি দেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে মুক্তি দেবেন। মহানবী (সা.) তাকে রেখে গেলেন। পরবর্তী দিন তিনি তাকে বললেন, ছুমামা তোমার কী ধারণা? তখন সে বলল, আগেই তো বলেছি। তখন তিনি বললেন, তাকে মুক্তি দাও। মুক্তি পাওয়ার পর সে মসজিদের একটি নিকটবর্তী খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করল, তারপর আবার মসজিদে প্রবেশ করল। আর সাক্ষ্য দিল আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই ও মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল। অতঃপর বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম আমার কাছে পৃথিবীর বুকে আপনার চেহারার চেয়ে ঘৃণিত চেহারা দ্বিতীয়টি ছিল না। এখন আমার কাছে আপনার চেহারা সবচেয়ে প্রিয় হয়ে গেল। আমার কাছে পৃথিবীতে আপনার ধর্মের চেয়ে ঘৃণিত ধর্ম ছিল না। এখন আপনার ধর্ম আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ধর্মে পরিণত হলো। আল্লাহর কসম! আপনার শহরের চেয়ে ঘৃণিত শহর ছিল না। এখন আপনার শহরের চেয়ে প্রিয় শহর নেই। নিশ্চয়ই আপনার অশ্বারোহী দলের হাতে আমি পাকড়াও হয়েছি এখন আমি ওমরা করার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি। আপনি কী বলেন? তখন নবী (সা.) তাকে সুসংবাদ দিলেন এবং তাকে ওমরার অনুমতি দিলেন। যখন সে মক্কায় এল, একজন তাকে বলল, তুমি তো পথভ্রষ্ট হয়েছ। তখন সে বলল–না, বরং আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি মুহাম্মদের হাতে, আল্লাহর কসম! ইয়ামামা থেকে একটি গমের দানাও রাসূল (সা.)-এর অনুমতি ছাড়া তোমরা পাবে না।' (বুখারী, হাদীস : ৪৩৭২)

এ রকম অসংখ্য উদারতা ও সদাচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

ইসলামের উদারতায় প্রতিপক্ষ যোদ্ধাদের ইসলাম গ্রহণ

হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রের কয়েকজন সরদার মারা যায়। কেউ কেউ পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজন বন্দিরূপে এবং মালামাল গনিমত হিসেবে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে। এর মধ্যে ছিল ছয় হাজার বন্দি, ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজারেরও বেশি বকরি এবং প্রায় চার মণ রুপা। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু সুফিয়ান বিন হারবকে গনিমতের এসব মালামালের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তার পরও হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রদ্বয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে জড়ো হয়; কিন্তু সব জায়গায় তারা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত তায়েফের এক মজবুত দুর্গে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ১০ থেকে ২০ দিন এই দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। ওরা দুর্গ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস তাদের ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এদের বদদু'আ দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এদের হেদায়েতের জন্য দু'আ করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে তিনি মক্কা গিয়ে ওমরা পালন, তারপর মদিনা প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা.)-এর দু'আ কবুল করে তাদের হেদায়েত দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন জি'রানা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক হুনাইনের যুদ্ধের পর নজিরবিহীন এ ঘটনা সংঘটিত হয়। যুদ্ধের পরই হাওয়াজিন গোত্রের অবশিষ্ট লোকেরা সদলবলে ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়। সত্য, ন্যায় ও হেদায়েতের এই মিছিলে দলনেতা মালিক বিন আউফও যোগ দেন। যুদ্ধের প্রায় ২০ দিন পর এই ঘটনা ঘটে।

ইতিমধ্যেই তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ গনিমত হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। এখানে নতুন সংকট দেখা দেয়, মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর তারা তাদের সম্পদের দাবি জানায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের দুটি বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি পথ বেছে নিতে বলেন। হয়তো তারা তাদের ওই সম্পদ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে অথবা সম্পদের পরিবর্তে তাদের ছয় হাজার যুদ্ধবন্দিকে ফেরত নিয়ে যাবে। তারা তাদের বন্দিদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হয়। মুজাহিদদের ছাড়াও এই বিপুল সম্পদ থেকে সেসব নওমুসলিমদেরও একটা বিশেষ অংশ দেওয়া হয়, মক্কা বিজয়ের পর যারা মুসলমান হয়েছিল। তাদের অনেককে রাসূলুল্লাহ (সা.) ১০০ করে উট দান করেছেন। হাওয়াজিন গোত্রের নেতা মালিক বিন আউফকেও ১০০ উট দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে নিজ গোত্রের সরদারও বানিয়ে দেন। আগেও তিনি সেই গোত্রের সরদার ছিলেন, তবে সেটা ছিল অমুসলিম হিসেবে। এবার তিনি একই গোত্রের সরদার হয়েছেন মুসলমানদের নেতা হিসেবে (ইবনে কাছীর, তাফসীরে মুনীর)।

অমুসলিমদের দান-সদকা করার বিধান

সদকা শব্দটি সাধারণত নফল দান-অনুদান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সেই অর্থে যেকোনো অমুসলিমকে দান করা সব আলেমের ঐকমত্যে বৈধ। অমুসলিম প্রতিবেশী আক্রান্ত হলে, তারা বিপদগ্রস্ত হলে মুসলমানদের উচিত তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।

আর সদকা শব্দটি কখনো যাকাত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এটি অমুসলিমদের দেওয়া যায় না। ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি। কেবল যাকাতের ক্ষেত্রে বিধানের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখা হয়েছে, অন্যথায় যেকোনো দান-সদকা, এমনকি ফিতরাও অমুসলিমদের দেওয়া যায়। এখানে লক্ষণীয় যে যাকাত দিতে হয় বছরে একবার। মুসলিম ধনীদের মধ্যে কারো প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপা কিংবা এর অর্থমূল্য পরিমাণ সম্পদ মজুদ থাকলে এবং এর ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়। এটি ধনীদের সম্পদ থেকে ২.৫ শতাংশ আদায় করতে হয়। অন্যদিকে সদকা বছরের যেকোনো সময় অনির্দিষ্ট পরিমাণ মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে দেওয়া যায়। তা ছাড়া সদকা ধনীরা ছাড়াও যে কেউ আদায় করতে পারে।

অমুসলিম অত্মীয়স্বজনের অধিকার

সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে গিয়ে নানা শ্রেণির, নানা পেশার, নানা মত ও পথের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদেরও। অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী। যদি কারো প্রতিবেশী কিংবা কোনো আত্মীয় অমুসলিম হয়, ইসলামের নির্দেশনা হলো–তার সঙ্গেও প্রতিবেশী বা আত্মীয়তার অধিকার রক্ষা করে চলতে হবে।

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।' (সহীহ বুখারী : হাদীস ৬১৩৮)

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমার পিতামাতা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান (দলিল ও প্রমাণ) নেই, তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সঙ্গে সদাচরণ করো। আর এমন ব্যক্তির পথ অনুসরণ করো, যে একান্তভাবে আমার অভিমুখী হয়েছে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের সে বিষয়ে অবহিত করব, যা তোমরা করতে।' (সূরা লোকমান : ১৫)

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ (إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ) وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ.

তিনি বলেন, আমার মা আমার কাছে এলেন রাসূলের যুগে মুশরিক অবস্থায়। তখন আমি রাসূল (সা.) থেকে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করে বললাম, আমার মা এসেছেন, তিনি ইসলাম ধর্মবিমুখ। আমি কি তাঁর আত্মীয়তা রক্ষা করব? তখন তিনি বলেন–হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রেখো। (বুখারী, হাদীস : ২৬২০)

ইসলামের প্রধান লক্ষ্য মানবতার কল্যাণ। মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে বৈরী মনোভাব দূর করার জন্য পারস্পরিক লেনদেন, দান-অনুদান বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। মানবতার বাসযোগ্য একটি সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠনের বিকল্প নেই।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী

মানুষের চিন্তা করতে হবে :
মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের ব্যাপারে চিন্তা করবে। আল্লাহ তা'আলা আসমান কিভাবে সৃষ্টি করলেন? জমিন কিভাবে বানালেন? এত বৃহৎ আসমান যার কোনো খুঁটি নেই। খুঁটিবিহীন সৃষ্টি করেছেন। বানিয়েছেন চাঁদ-সূর্য। এসবের রোশনি কেমন। সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়ায় একটিই চাঁদ। এর রোশনিতে সারা পৃথিবী আলোকিত। এমন চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহর বড়ত্ব ও আজমত সৃষ্টি হবে অন্তরে।

অতিকথনের ক্ষতি :
চুপ থাকার গুণ অর্জন করা। প্রয়োজন ছাড়া না বলা। চুপ থাকায় বহুরূপ উপকার। কথা বলার মধ্যে দুটি শক্তি ব্যয় হয়। যেমন–টর্চ লাইটে ব্যাটারি থাকে। জরুরত ছাড়া বারবার তা অন করলে এর চার্জ হ্রাস পায়। তাড়াতাড়িই এর ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি বেশি কথা বলার দ্বারা মানুষের দেমাগ খরচ হয়। আবার এর কারণে স্মরণশক্তির ওপর প্রভাব পড়ে।

স্মরণশক্তি অতি গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত :
কুওয়াতে হাফেজা বা ধীশক্তি বৃহৎ নেয়ামত। এর মূল্যায়ন এবং সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি। বড় বড় প্রতিভাবান ব্যক্তি! তাঁরা কিভাবে স্মরণশক্তিকে হেফাজত করেছেন? কেউ কেউ বলেছেন, মক্কা শরীফে বিন বায নামে একজন বড় আলেম আছেন। আরবের বড় আলেমদের মধ্যে তিনি অন্যতম। দশ-বারো বছর বয়সে রোগের কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি উদাও হয়ে যায়। ডাক্তাররা বলেছেন, বর্তমানে এমন আধুনিক মেশিনারিজ তৈরি হয়েছে এবং ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে, যার মাধ্যমে আপনার চোখ অপারেশন করা হলে আপনি দেখতে পাবেন। তিনি ডাক্তারদের বললেন, তাতে স্মরণশক্তিতে কোনো প্রকার প্রভাব পড়বে না তো? ডাক্তাররা বললেন, তাতে কিছু না কিছু প্রভাব তো পড়বেই। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে এভাবেই থাকতে দিন। দেখুন, তিনি স্মরণশক্তির হেফাজতের জন্য দৃষ্টিশক্তির জন্য আগ্রহী হলেন না। কত বড় কথা? সারা জীবন অন্ধ অবস্থায় থাকাকে পছন্দ করলেন, যাতে ধীশক্তির ওপর কোনো প্রভাব না পড়ে। লক্ষ্ণৌর বিভিন্ন লোকের কাছে শুনেছি, সেখানে এমন এমন অন্ধ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা হাতে ছুঁয়ে বলে দিতে পারেন কাপড়টি সাদা কি লাল, নাকি অন্য রঙের। কথা হলো আল্লাহ তা'আলা কারো কারো অন্তরকে আলোকিত করে দেন। চোখ ছাড়াই দেখার কাজ অন্তরের আলো দ্বারা সম্পন্ন করতে পারেন। একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিল তার নামই ছিল 'বীনা দিল'। যেমন চেরাগের আলো, গ্যাসের আলো এবং লাইটের আলো তেমনি অন্তরেরও আলো হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সেরূপ আলো দান করেন।

আল্লামা কাশ্মীরি (রহ.)-এর ধীশক্তি :
নিকট অতীতেও অনেক প্রখর স্মরণশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দের সদরে মুদাররিস ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে হযরত মুফতী মাহমূদুল হাসান (রহ.) বলেন, হযরত শাহ সাহেব সবকে ফতহুল কদীর আর ফতহুল বারীর রেফারেন্স দিতেন না। বরং এসব কিতাবের এবারত পড়ে শোনাতেন। একসময় ছাত্রদের বলেন, তোমরা মনে করো হয়তো আমি রাতে এসব কিতাব দেখে এসে তোমাদের সামনে এবারত বলে থাকি। এমন নয়। বরং আমি ওই কিতাব দেখেছি এত বছর আগে, ওই কিতাব দেখেছি এত বছর পূর্বে। যখন যে বিষয় দেখেন সেগুলো ধীশক্তি বলে আপন মেমোরিতে সংরক্ষিত হয়ে যেত। এই স্মরণশক্তি আল্লাহর বড় নেয়ামত। একে হেফাজত করা খুবই জরুরি।

ধীশক্তিকে দুর্বলকারী কিছু বিষয় :
টকজাতীয় বস্তু ব্যবহারে ধীশক্তি হ্রাস পায়। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) টকজাতীয় বস্তু ব্যবহার করতেন না। স্মরণশক্তিকে অটুট রাখার জন্য তিনি সারা জীবন টক আম খাননি। অথচ আমরা টকজাতীয় কত বস্তুই ব্যবহার করে থাকি। অতিরিক্ত পানি পানেও স্মরণশক্তি হ্রাস পায়। কারণ পানির কারণে কফ সৃষ্টি হয়। কফের কারণে স্মরণশক্তি প্রভাবিত হয়। স্মরণশক্তির জন্য পাপকাজ বড়ই ভয়ংকর। গোনাহের কারণে স্মরণশক্তি হ্রাস পায়। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) নিজ উস্তাদ হযরত ওয়াকী (রহ.)-এর কাছে স্মরণশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তিনি বলেন,

شكوت الي وكيع سوء حفظى

অন্যের যেমন প্রখর ধীশক্তি, তেমন শক্তি আমার নেই। অর্থাৎ স্মরণশক্তি তো আছে কিন্তু ওই লোকের যে স্মরণশক্তি, সেরূপ আমার নেই। এমন অভিযোগ করলেন উস্তাদের কাছে। উস্তাদ কী জবাব দিলেন,

فاوصانى الى ترك المعاصى

তিনি আমাকে গোনাহ ছাড়তে আদেশ করলেন। কারণ–

فان الحفظ نور من الله
ونور الله لايعطى لعاصى

কারণ, স্মরণশক্তি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর। আর আল্লাহর নূর গোনাহগারদের দেওয়া হয় না।
সুতরাং ভাইয়েরা গোনাহ থেকে বাঁচার খুব চেষ্টা করুন এবং স্মরণশক্তির জন্য অপকারী বিষয়গুলো পরিহার করুন।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

বন্ধুত্ব ও শত্রুতা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم: اما بعد: فعن ابى هريرة قال رسول الله ﷺ : احبب حبيبك هوناما عسى ان يكون بغيضك يوماما وابغض بغيضك هو ناما عسى ان يكون حبيبك يوماما۔

পঠিত হাদীসটি জীবন চলার পথে আমাদের জন্য বড় আজীব পাথেয় এবং মূলনীতিও বটে। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব রয়ে-সয়ে করো (মধ্যপন্থা বজায় রেখে করো)। কারণ হতে পারে সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে! আর শত্রুর সাথে শত্রুতা রয়ে-সয়ে করো। কারণ সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যেতে পারে।' (তিরমিযী)

এই হাদীসে আমাদেরকে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে বন্ধুর সাথে বন্ধুত্বে এবং শত্রুর সাথে শত্রুতায় সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে না। বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তাদের জন্য, যাদের অবস্থা এই যে যখন কারো সাথে তাদের বন্ধুত্ব হয়, ঘনিষ্ঠতা হয়, হয় ভালোবাসা, তখন তাদের বন্ধুত্ব বেপরোয়া গতিতে চলতে থাকে, হয়ে যায় নিয়ন্ত্রণহীন। ফলে বন্ধু ও প্রিয়জনের কোনো দোষ তার চোখে পড়ে না উঠাবসা, চলাফেরা, খাওয়াদাওয়া–সব কিছুই তাকে ছাড়া হয় না, তার সংস্পর্শে থাকাটাই হয়ে ওঠে মুখ্য বিষয়, অন্য সব কিছুই গৌণ। নিজেকে উজাড় করে দেয় তার গুণকীর্তনে। তাকে ছাড়া রাত কাটে না, কাটে না দিন। কিন্তু একদিন রাসূল (সা.)-এর শাশ্বত বাণীর প্রতিফলন ঘটে, তিনি বলেন,

ان لكل شئ شرة ولكل شرة فترة

প্রতিটি জিনিসেরই জোয়ার আসে, আবার সেই জোয়ারে ভাটাও আসে। (তিরমিযী) তাদের বেলায়ও ঠিক তাই ঘটে, তাদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরে এবং তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে একে অপরের ছায়া পর্যন্ত দেখা সহ্য করে না। এবার সাবেক বন্ধুর মাঝে ভালো বলতে কোনো জিনিস নজরে পড়ে না। মূলত সে অন্ধ হয়ে গেছে, অন্ধ সে আগেও ছিল তবে পার্থক্য এতটুকু যে পূর্বেকার অন্ধত্বে মন্দ দেখেনি, আর এখনকার অন্ধত্বে ভালো দেখে না! এ ধরনের ভারসাম্যহীন বন্ধুত্ব ও শত্রুতা থেকেই রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। সহী অর্থে মাখলুকের মধ্যে বন্ধুত্বের উপযুক্ত কেউ নেই, আসল মহব্বতের উপযুক্ত তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। অন্তরে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত তো একমাত্র তিনিই। তিনি অন্তর সৃষ্টি করেছেন সেখানে শুধুমাত্র তাঁকেই স্থান দেওয়ার জন্য। কোনো মুমিন এখানে অন্যকে স্থান দিতে পারে না। রাসূল (সা.)-এর মহব্বত আল্লাহর মহব্বতের তাবে। অনুরূপ অন্য যার প্রতিই মহব্বত হবে তা

الحب فى الله الحب لله

এর আলোকেই হতে হবে।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর বাণী

এই পৃথিবীতে কেউ যদি সত্যিকারের দোস্তি ও বন্ধুত্বের দাবি করার মতো থাকে তবে তিনি হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। রাসূল (সা.)-এর জন্য হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বেশি ও বড় কুরবানী দ্বিতীয়জন করেননি। দুনিয়াতে বন্ধুত্বের হক্ব যদি কেউ আদায় করে থাকেন তাহলে তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রা.)। তাঁর অবদানের কথা স্বীকার করে স্বয়ং রাসূল (সা.) বলেন,

ان من ابر الناس على فى صحبته وما له ابوبكر

আমার ওপর আবু বকরের সঙ্গ ও আর্থিক অবদান অন্য সবার চেয়ে বেশি। (মুসলিম) কিন্তু এর পরও তাঁর ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেন,

لوكنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوة الاسلام

যদি আমি কাউকে আন্তরিক বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তবে আবু বকরকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। আবু বকর আমার দ্বীনি ভাই মাত্র। (বুখারী) অর্থাৎ যদি আমি দুনিয়াতে কাউকে সত্যিকারার্থে দোস্ত বানাতাম তবে আবু বকরকেই বানাতাম। কিন্তু তাকেও দোস্ত বানাতে পারি না। যেহেতু দুনিয়ার কেউ সত্যিকারের দোস্ত হওয়ার উপযুক্ত নয়। কারণ যে দোস্তি মানুষের অন্তরকে বশীভূত করে দোস্তের অনুগামী করে ফেলে, সে করতে বললে করে, না করতে বললে করে না। এ ধরনের বন্ধুত্ব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে হতে পারে না।

শত্রুতায় ভারসাম্য

অনুরূপভাবে কারো সাথে শত্রুতা ও সম্পর্ক ভালো না থাকার কারণে সব সময় তার দোষের অনুসন্ধান করে

বেড়ানো এটাও সীমালঙ্ঘন। ভুলে গেলে চলবে না যে একজন ব্যক্তি মন্দ হলেও আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে কিছু ভালো দিকও রাখেন। অতএব শত্রুতার কারণে এই ভালো দিকগুলো স্বীকার না করে পাশ কেটে যাওয়া চরম অন্যায়, কোরআনেও এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। ইরশাদ করেন,

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا

কারো প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। (মায়েদা-৮)

হাজ্জাজের ব্যাপারে ইবনে ওমরের (রা.) উপদেশ

হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে চেনে না, জানে না–এমন মুসলমান কে আছে? সে অনেক সাহাবাকে খুন করেছে, অসংখ্য তাবেঈন, তাবেতাবেঈনদের খুনি, তার হাত লাখো লাখো মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত। শুধু তাই নয়, সে বায়তুল্লাহর ওপর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে, যত সব জঘন্য কাজ সে করেছে। যে কেউ তার ইতিহাস অধ্যায়ন করলে অন্তরে ঘৃণা জন্মাবে–এটাই স্বাভাবিক! একদিন হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.)-এর উপস্থিতিতে খুনি হাজ্জাজের আলোচনা শুরু হলো, আলোচনায় এমন কিছু বিষয়ও উঠে এল, যা তার গীবতের পর্যায়ে পড়ে। এতদশ্রবণে ইবনে ওমর (রা.) সাথে সাথে বললেন, দেখো! তোমরা মনে করো না যে হাজ্জাজ একজন জালেম ও খুনি বলে তার গীবত বৈধ হয়ে গেছে। তার ওপর অপবাদ আরোপ করা জায়েয হয়ে গেছে। মনে রেখো! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যেমন খুন ও জুলুমের বাবদ হাজ্জাজের বিচার করবেন, তেমনি তার গীবত করার কারণে তোমারও বিচার করবেন। এটা মনে করো না যে সে একজন জালেম ও খুনি বলে তার ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই বলা বৈধ হয়ে গেছে। অতএব হে আল্লাহর বান্দারা! কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করলে ভারসাম্য রক্ষা করে করো। আর কারো প্রতি দোস্তি ও ভালোবাসা থাকলে সে ক্ষেত্রেও ভারসাম্য রক্ষা করো। কারো সাথে মতভেদ থাকলে তার প্রকৃত নাম বাদ দিয়ে বিকৃত নামে সম্বোধন করা কত বড় অন্যায়-গীবতের অন্তর্ভুক্ত তা একজন সাধারণ মুসলমানেরও জানা, প্রকৃত আলেমদের কথা না হয় বাদই দিলাম। আরে ভাই, কিছু অসভ্য তো এমনও আছে, যাদের বিকৃত মনমানসিকতা থেকে সহমত পোষণকারীরা পর্যন্ত নিস্তার পায় না, তাদেরকেও তারা বিকৃত নামে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে থাকে। তাদের সামনে কি কোরআনের এই শাশ্বত বাণী নেই নাকি তারা এতে বিশ্বাসী নয়। (নাউযুবিল্লাহ)

ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔

"তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পরে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ।"

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

সন্তানের আখলাক-চরিত্র রক্ষায় সচেষ্ট হোন

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

সচেতন পিতা-মাতার পরিচয় হলো, সন্তানের সার্বিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, পিতা-মাতার অসচেতনতা, অদূরদর্শিতা এবং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন সন্তানদের দুনিয়া-আখেরাত সব বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্ম ক্রমে দ্বীন-ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং প্রযুক্তির সয়লাবে গা ভাসিয়ে দিয়ে আখলাক-চরিত্র সব খোয়াতে বসেছে। এসব কিছুর পেছনে যে বিষয়টি রয়েছে তা হলো, সন্তানদের সময়মতো বিবাহ না দেওয়া। ছেলেমেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো দ্বীনদার পাত্র-পাত্রী দেখে বিয়ে দিয়ে দেওয়া। ছেলেদের দাড়ি গজানোর দ্বারা আর মেয়েদের ঋতু শুরু হওয়ার দ্বারা পিতা-মাতাকে এ কথা বোঝানো হয় যে তাদের বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, আর দেরি করা যাবে না। অতএব প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর দ্রুত সময়ের মধ্যেই তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দেওয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। এর পরও যদি না দেওয়া হয়, আর এ কারণে ছেলেমেয়ে কোনো গোনাহে লিপ্ত হয়, অন্য কারো সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যায়, ইন্টারনেটে অশ্লীল ছবি দেখে, তাহলে এ গোনাহের দায়দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপর বর্তাবে। হাদীস শরীফে আছে,

من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه، فاذا بلغ فليزوجه فان بلغ ولم يزوجه فاصاب اثما، فانما اثمه على ابيه ـ

সন্তান জন্মগ্রহণের পর পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো তার সুন্দর নাম রাখা এবং দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, আর বালেগ হয়ে গেলে বিবাহ করিয়ে দেওয়া। যদি বালেগ হওয়ার পরও বিবাহ না করায়, আর সন্তান কোনো গোনাহে লিপ্ত হয়, তাহলে এর দায়ভার পিতার ওপরই বর্তাবে। (বায়হাকী, হাদীস নং ৮২৯৯)

অন্য একটি হাদীসে আছে, পিতা-মাতার ওপর সন্তানের হক্ব হলো, সুন্দর নাম রাখা, আকীকা করা, দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, বালেগ হওয়ার পর বিয়ে দেওয়া। (কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ, হাদীস নং ১৫৫)।

কাজেই পিতা-মাতার দায়িত্ব শেষ হবে সন্তানকে বিয়ে দেওয়ার পর। (আওলাদ কো মুসলমান বানানে কা তরীকা, ২৭৩)

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আজ মুসলিম উম্মাহ ইহুদি-খ্রিস্টানদের নানামুখী ষড়যন্ত্রের শিকার। এ দেশে যত এনজিও আছে, এর অধিকাংশই ইহুদি-খ্রিস্টানদের অর্থে পরিচালিত। তারা সমন্বিত প্রচেষ্টায় সরকারকে দিয়ে এ আইন পাস করিয়েছে যে ১৮ বছরের আগে কোনো মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না। তাদের ভাষায় এটা হলো "বাল্যবিবাহ"। অথচ মেয়েরা সাধারণত আরো চার-পাঁচ বছর আগেই বালেগা হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একবার বলেছিলেন, এই আইনটা ১৬ বছরে করা হোক। কারণ মেয়েরা এতটা সময় (১৮ বছর) বসে থাকে না। পারিপার্শ্বিকতাসহ বিভিন্ন কারণে তাদের পক্ষে চারিত্রিক পবিত্রতা ধরে রাখা সম্ভবপর হয় না। বন্ধু-বান্ধবের হাত ধরে চলে যায়, নানা অঘটন ঘটায়। কিন্তু এনজিওদের হৈচৈয়ের কারণে সেটা আর সম্ভবপর হয়নি। এনজিওগুলো এই আইনটি পাস করিয়েছে মূলত যিনা-ব্যভিচারকে ব্যাপক করার জন্য। এর জন্য তারা মুড়ি-মুড়কির মতো দেদার জন্মবিরতীকরণ ট্যাবলেট ও বিভিন্ন উপকরণ সাপ্লাই দেয়। এর পরও কোনো মেয়ে যদি বিপদে পড়ে যায়, পেটে অবৈধ সন্তান চলে আসে–এর জন্য তারা 'মেরি স্টোপস' প্রতিষ্ঠা করেছে, যার কাজ হলো মাতৃসেবার ছদ্মনামে অবৈধ গর্ভপাতের নিরাপদ আলয় তৈরি করা। আর মুসলমানরা মনে করছে, আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সরকার কত রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। (হামারে আয়েলী মাসায়েল, ১৬০)

অপরদিকে এনজিওগুলো জনসাধারণের মস্তিষ্কে বিভ্রান্তির এক ভূত ঢুকিয়ে দিয়েছে যে ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যাবে না। আর বাপ-মা খাঁড়া করেছে দুই ভূত ।

ক. এক হলো, পড়াশোনা শেষ করা, চাকরি ঠিক হওয়া। অনেক সময় দেখা যায় তাদের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেটি বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে প্রস্তাব দেয়, আব্বা! আমি গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিয়ে করার দরকার মনে করছি। আর বাপ-মা বলে, তোর তো এখনো লেখাপড়াই শেষ হয়নি, বিয়ে করে বউকে খাওয়াবি কোত্থেকে? (এর উত্তরে আমরা বলব,) কেন, সে কি পড়াশোনার পাশাপাশি দু-একটা টিউশনি করে কিছু রোজগার করতে পারবে না? যদি নাও পারে তাহলে আপনার প্রিয় রাসূল তো বলেই গেছেন,

طعام الواحد يكفى الاثنين

একজনের খাবার দুজনের জন্য যথেষ্ট। দুজনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-২০৫৯) আপনার ফ্যামিলিতে দু-চারজন সদস্য অবশ্যই আছে, আরেকজন এলে কি তার জন্য ব্যবস্থা হবে না? অবশ্যই হবে। তো পড়ালেখা শেষ হওয়ার দরকার নেই। বালেগ হলেই বিয়ে দিয়ে দেন। রিযিকের মালিক আল্লাহ।

খ. দ্বিতীয় ভূত হলো সিরিয়াল রক্ষা করা। যেমন–এক ছেলে দ্বীনদার, আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে যায়। সে গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিয়ে করতে চায়, কিন্তু সিরিয়ালে তিন নম্বরে। অর্থাৎ তার আগে আরো দুজন রয়ে গেছে। তখন বাবা-মা বলে, আরে! তোর আগে তো আরো দুজন রয়ে গেছে। তাদেরকে বাদ দিয়ে তোকে বিয়ে করাব কিভাবে? প্রিয় পাঠক! শরীয়তে কোনো সিরিয়াল নেই। যার যখন পাত্র/পাত্রী পাওয়া যাবে, বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। এর বড় দলিল হলো, হযরত মূসা (আ.) যখন ফেরাউনের রাজত্ব থেকে সঙ্গোপনে হযরত শুআইব (আ.)-এর দেশে হিজরত করলেন। আর শুআইব (আ.) তাঁর কন্যাদের কাছ থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বীনদারির এ বর্ণনা শুনলেন যে আসার সময় কন্যারা যখন তাঁর আগে আগে চলে তাঁকে রাস্তা দেখাচ্ছিল তখন মূসা (আ.) তাদের বলেছেন যে তোমরা আমার পেছন পেছন আসো এবং পেছন থেকেই রাস্তা বাতলে দাও। এতে হযরত শুআইব (আ.) বুঝতে পারলেন, এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে বড় কিছু হবেন। তখন তিনি হযরত মূসা (আ.)-কে প্রস্তাব পেশ করলেন–দেখো, আমার দুই মেয়ের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয় তাকে তোমার সাথে বিয়ে দেব। (সূরা কাসাস, ২৭) দেখুন, তিনি বলেছেন- احد ابنتى هتين 'আমার এই দুই মেয়ের কোনো একজন। এ কথা বলেননি, বড়জনকে বিয়ে দেব, বরং বলেছেন, দুজনের যাকেই তোমার পছন্দ হয়...। অথচ আমাদের দেশে সিরিয়াল রক্ষা করাকে জরুরি মনে করা হয়। ফলে সিরিয়াল ভেঙে কেউই ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। এভাবে সময়মতো বিয়েশাদি না দেওয়ার কারণে আজ আমাদের ছেলেমেয়েরা বখে যাচ্ছে, ইন্টারনেটে যত পাপাচার আছে সেগুলো দেখে দেহ-মন সব নষ্ট করে ফেলছে। কাজেই সচেতন অভিভাবকদেরকে বলছি, আপনারা আপনাদের ছেলেমেয়েকে গোনাহ থেকে বাঁচান, মোবাইল, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার থেকেও বাঁচান এবং সময়মতো বিবাহ দিয়ে তাদেরকে গোনাহমুক্ত ইসলামী যিন্দেগী যাপনের সুযোগ করে দিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সহজ-সরল ও পাপমুক্ত জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাযহাব অনুসরণ; তাৎপর্য ও বাস্তবতা-২

মুফতি আবুল কাসেম নোমানী মুহতামিম : দারুল উলূম দেওবন্দ
অনুবাদ : সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী

[১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, মোতাবেক ১ রবিউস সানী ১৪৩৪ হিজরী, রোজ বুধবার, দারুল উলূম দেওবন্দে অনুষ্ঠিতব্য "তাহাফফুজে সুন্নাহ" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় পঠিত সভাপতির লিখিত বক্তব্যের সরল অনুবাদ]

তাকলিদ ও আকাবিরে দেওবন্দের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান :

সম্মানিত সুধী! আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর উল্লিখিত পাঠ দ্বারা যে অবকাশ এবং ভারসাম্যের দিকে ঈঙ্গিত হয় তা আরো ব্যাপকতার সাথে দেওবন্দী মতাদর্শের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একদিকে শরীয়তের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাকলিদকে আবশ্যকীয় মনে করে। অন্যদিকে তাতে অতিরঞ্জনও বৈধ মনে করে না। এ দুটি বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য কয়েকজন আকাবিরে দেওবন্দের ইবারত-মূলপাঠ উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

সর্বপ্রথম ইমামে রব্বানী হযরত মওলানা মুফতি রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.)-এর ফাতাওয়া উল্লেখ করা হচ্ছে, যা হযরতের সুগভীর পাণ্ডিত্য ও "তাফাক্কুহ ফি দ্দীন"এবং ইসলামী শরীয়তের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রতিভার" প্রমাণ বহন করে।

"সাধারণ তাকলিদ" ফরয, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

[যদি না জানো, তাহলে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নাও] আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে সাধারণ তাকলিদকে ফরজ বলেছেন। বস্তুত তাকলিদের দুটি স্তর রয়েছে। এক. "তাকলিদে শাখছি" [নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ] অর্থাৎ সকল বিষয় ও সব মাসআলায় একজন ইমামের অনুসরণ করা। দুই. "তাকলিদে গায়রে শাখছি" [অনির্দিষ্ট অনুসরণ] অর্থাৎ যেকোনো ইমামের মত অনুসরণ করে আমল করা।

উপরোক্ত আয়াতে উভয় প্রকার তাকলিদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অতএব উভয় প্রকার তাকলিদ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত ও নির্ধারিত। যে ব্যক্তি এই দুই প্রকার তাকলিদের যেকোনো একটির ওপর আমল করবে সে আল্লাহর নির্দেশিত উক্ত ফরযের ওপর আমলকারী হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি "তাকলিদে শাখছি"-কে শিরিক বা বিদ'আত বলবে সে অজ্ঞ ও গোমরাহ। কেননা সে আল্লাহ তা'আলার বিধানকে আল্লাহর বিপক্ষে শিরিক বলছে। সে জানে না, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দান করেছেন। মানুষ যে অংশের ওপরই চায়, আমল করতে পারে। কেননা "সাধারণ" সাধারণ হিসেবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই বরং নির্দিষ্ট সত্তার মাধ্যমেই তার অস্তিত্ব বিদ্যমান হয়। যেমন–মানুষ মানুষ হিসেবে তার কোনো অস্তিত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। বরং যায়েদ, খালিদ প্রমুখ ব্যক্তির মাধ্যমেই মানুষ অস্তিত্ববান হয়। তেমনি তাকলিদের অস্তিত্বও হয়তো "তাকলিদে শাখছি"র মাধ্যমে অস্তিত্বে আসে অথবা "গায়রে শাখছি"র মাধ্যমে। সুতরাং উভয় প্রকার তাকলিদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য স্বাধীনতা রয়েছে। যেটার ওপর চাইবে আমল করতে পারবে এবং তাতে আল্লাহর হুকুমের ওপর আমলকারী সাব্যস্ত হবে এবং তাতে আল্লাহর ধরপাকড় থেকে মুক্তি পাবে। অতএব আল্লাহর নির্দেশিত হুকুমকে শিরিক বা বিদ'আত বলা গোনাহের কাজ বৈ কিছু নয়। মূলত উভয় তাকলিদের বৈধতার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে যেহেতু সাধারণ মুসলমান, এমনকি বিশেষ ব্যক্তিরা পর্যন্ত প্রবৃত্তির প্রতি ধাবিত,

اعجاب كل ذى رأى برأيه

এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মতের ওপর সন্তুষ্ট ও শরীয়ত অনুমোদিত নয়–এমন তাকলিদের পূজারী হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং নিজের পছন্দনীয় বস্তুকে বৈধতাদানের সুযোগ তৈরিতে সচেষ্ট, দ্বীনের প্রতি উদাসীন, ইমামগণের নিন্দা এবং মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছেদের সম্ভাবনা অধিকতর হয়েছে; এ জন্য সকল ক্ষতির আশঙ্কা বিবেচনায় রেখেই "তাকলিদে গায়রে শাখছি" গ্রহণ করার অনুমতি রহিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র "তাকলিদে শাখছি"র ওপর আমল করাই আল্লাহ তা'আলার হুকুম فاسئلوااهل الذكر [তোমরা জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নাও]-এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কেননা [ইজমা] ঐক্য ও ইত্তিহাদ দ্বীনে ইসলামের বড় খুঁটি, তা রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

[তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধরো] وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ [আল্লাহ অনৈক্যকে পছন্দ করেন না] এ

সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অতএব এই মহা ফরযকে রক্ষা করতে এবং ওই সকল বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের কারণসমূহকে সামনে রেখেই তাকলিদের একাংশকে ছেড়ে দিয়ে অপরাংশ "তাকলিদে শাখছি" [যা মূলত এই মহা ফরযের জন্য সহায়ক ও শক্তি সঞ্চয়কারী বরং বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যকে বিলুপ্তকারী]-কে গ্রহণ করা; হুবহু সাহাবায়ে কেরামগণের নির্দেশ মান্য করা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত পথে আমল করা। যেমন–সাতভাবে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার অনুমতি ছিল। হযরত ওসমান (রা.) সকল সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে শুধুমাত্র কুরাইশের পাঠকেই অনুমোদন দিয়ে অবশিষ্ট সকল পাঠকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এটি কেবলমাত্র বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য দূরীভূত করার লক্ষ্যেই করা হয়েছিল। সহীহ বুখারী শরীফেও তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) হত্যাযোগ্য অপরাধী জুলখুয়াইছারা-এর হত্যার ব্যাপারে বলেছিলেন,

دعه فان الناس يقولون أن محمدايقتل اصحابه

[তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লোকেরা বলবে দেখো, মুহাম্মদ তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করছে] অথচ সে রাসূলের শানে বেয়াদবী ও কুফুরী কালিমা উচ্চারণের কারণে হত্যার উপযোগী ছিল। এই হুকুমটি শুধুমাত্র ফেতনার আশঙ্কায় দেওয়া হয়েছিল।

মোটকথা, বর্তমান নৈতিকতা বিবর্জিত ভয়ানক পরিস্থিতিতে "তাকলিদে শাখছি"ই ওয়াজিব এবং "তাকলিদে গায়রে শাখছি"র কোনো সুযোগ নেই। অবশ্যই, যদি কোথাও এই সকল ফেতনা-ফ্যাসাদের আশঙ্কা না থাকে সেখানে "তাকলিদে শাখছি"র ন্যায় "তাকলিদে গায়রে শাখছি"র ওপরও আমল করার সুযোগ থাকবে। অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে তাকলিদে শাখছি [নির্দিষ্ট অনুসরণ] আবশ্যকীয় ওয়াজিব, তাকে বিদ'আত বলা বা শিরিক বলা অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়। (তা'লীফাতে রশীদিয়া ও ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, খ : ৬ পৃ : ২০৫)

এই যুগান্তকারী সর্বমর্মী ফাতওয়া তাকলিদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত। তা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে উলামায়ে দেওবন্দের সতর্কতামূলক অবস্থান ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নমুনাস্বরূপ নিম্নে কিছু প্রমাণ উত্থাপন করা হচ্ছে। সর্বপ্রথম হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর ইবারতের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি। "যদি প্রমাণিত হয় যে, কোনো মাসআলায় ইমামের সিদ্ধান্ত কোরআন-সুন্নাহর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক তখন প্রত্যেক মুসলমানকে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এটি সুস্পষ্ট বিষয় তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। (সাবীলুর রশাদ-৩০)

গায়রে মুকাল্লিদিনরা দলিল উপস্থাপনায় ভুলপন্থা অবলম্বন করেন, তা চিহ্নিত করে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.) "ঈযাহুল আদিল্লা" নামক কিতাবে লিখেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপরীত কোনো এক ব্যক্তির তাকলিদ হোক কিংবা শত-সহস্রজনের তাকলিদ, তা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। (ঈযাহুল আদিল্লা-২২৯)

হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, কোনো কোনো মুকাল্লিদ এমনও রয়েছে, যারা নিজেদের ইমামকে ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে মনে করে এবং সকল বিষয়ে তার সিদ্ধান্তকে যথার্থ জ্ঞান করে। তার কথা মান্য করা আবশ্যকীয় মনে করে। যদিও তার সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত হয় এবং ইমামের স্বীকৃত মতামতের পক্ষে যুক্তি ব্যতীত অন্য কোনো দলিল না থাকা সত্ত্বেও হাদীস শরীফে "ইলল ও খলল" [দুর্বলতা ও ত্রুটি] বের করে তার অপব্যাখ্যা করে হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে–এমন তাকলিদও অনুসরণ হারাম ও অবৈধ এবং আল্লাহর সংবাদ

اتخذوا أحبارهم

আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং সম্মানিত ইমামগণের অসিয়তের বিপরীত হবে। (ফাতাওয়ায়ে ইমদাদিয়া, খ : ৪ পৃ : ৮৮)

সম্মানিত সুধী!

আকাবিরে দেওবন্দের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানকে আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা কারী তৈয়ব সাহেব (রহ.) (সাবেক মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ)-এর বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ উল্লেখ করা সমুচিত মনে করছি। যেন আলোচিত বিষয়ের সারনির্যাস সংক্ষিপ্তাকারে সকলের সামনে উন্মোচিত হয়। এই নির্বাচিত অংশটি "তারিখে দারুল উলূম" থেকে সংগৃহীত। তা দ্বারা ফিকাহ ও দর্শনশাস্ত্রে দারুল উলূম দেওবন্দের মাসলাক ও মতাদর্শ স্পষ্ট হয়ে যায়।

ফিকহী মতাদর্শ সম্পর্কে তিনি বলেন, "দারুল উলূম দেওবন্দের ফিকহি মতাদর্শের মূলনীতি ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, الاعمال اولى من الاهمال [কোনা বস্তুকে প্রত্যাখ্যান করার চেয়ে তার ওপর আমল করা উত্তম] জ্ঞানী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র মূল্যবান বস্তু নয়, বরং নগণ্য বস্তুকেও অনর্থক মনে করেন না। পৃথিবীর সেরা উক্তি ও মূল্যবান বাণী হলো আল্লাহর বাণী ও রাসূলের কথা। অতএব তাঁর কোন অংশকে আমল অনুপযোগী ও অর্থহীন সাব্যস্ত করা এই মতাদর্শের স্বভাববিরোধী। ফলে বিভিন্ন প্রকার হাদীসের মধ্য থেকে যে হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্যের সাথে অধিক

সামঞ্জস্যশীল ও তাঁর লক্ষ্যের অধিক নিকটবর্তী হয় সেই হাদীসটিকে [ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতানুসারে] মাযহাবের ভিত্তি নির্ধারণ করে অন্য হাদীসগুলোকে নিজ নিজ স্থানে জুড়ে দেওয়া হয় তাতে সকল হাদীসের ওপর আমল হয়ে যায়। কোনো হাদীস আমলশূন্য থাকে না। অন্য ভাষায়, তাদের নিকট বিভিন্ন ধরনের হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই অগ্রাধিকার পায়। যেন বাস্তব সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ হাদীসসমূহকে প্রত্যাখ্যান না করে
কোনো ধরনের যৌক্তিক বা বর্ণিত ব্যাখ্যা ব্যতীত মূল হাদীসের অনুগামী করে আমলের ময়দানকে সম্প্রসারিত করা এবং অনর্থক বাতিল বলে নষ্ট না করা; যেন প্রিয় নবীর পবিত্র হাদীসের কোনো অংশ আমলহীন না হয়। এমনকি "মুরসাল" হাদীসকেও প্রত্যাখ্যান করার চেয়ে তার প্রামাণ্যতাকে সমর্থন করে। তাই ইমামগণের তাফাক্কুহ ও গবেষণা দ্বারা অর্জিত সকল দিক হাদীস সমর্থিত; হাদীসবহির্ভূত নয়। অন্য ভাষায়, সকল ইমামের ফিকহ সামগ্রিকভাবে [হানাফী] উক্ত মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অধিকন্তু অগ্রাধিকারযোগ্য হওয়া না হওয়া, পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় হওয়া, মৌলিক বা শাখাগত এবং আযিমত-রুখছত কিংবা উত্তম-অনুত্তমের পার্থক্য অবিশিষ্ট থাকতেই পারে। তবে কিছু কিছু স্থানে বৈধ-অবৈধেরও বিরোধ দেখা যায়, তবে তা অতি স্বল্প। তাতে হানাফী মাযহাবের পূর্ণতা এবং অন্যান্য মাযহাবের বিশুদ্ধতার ওপর কোনো
প্রভাব পড়ে না। চাই, দুটি "নসের" (কোরআন-হাদীসের মূল টেক্স) পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে হোক অথবা একটি নসের একাধিক অর্থের সম্ভাবনার কারণে হোক।
মূলত গবেষণাধর্মী বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। তবে তা ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত গড়ায় না যে, কারো ওপর ফিকহি মতাদর্শ বিমুখিতা বা তা থেকে পলায়নের অপবাদ দেওয়া যায়। অতএব মুজতাহিদ ইমামগণের মান-মর্যাদা ও সত্যবাদী হওয়ার বিষয়টি যথাস্থানে অক্ষুণ্ন থাকে। সুতারাং তাদের ফিকহি মতাদর্শের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব, সততা ও পূর্ণতার বিষয়ে কোনো
ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হবে না এবং এই মতানৈক্য হক্ব-বাতিলের মতানৈক্য নয়, যা বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতার কারণ হয়। বরং তা শুদ্ধ-অশুদ্ধকে লক্ষ রেখে সংঘটিত হয়। যার কোনো একটি দিকও প্রতিদানশূন্য নয়। স্পষ্ট যে, সকল ফিকহ ও ফিকহি গবেষণা এভাবে যখন এক কেন্দ্রে কুক্ষিগত হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে আপন স্থান ও অবস্থান অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যায় তখন শুধুমাত্র অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার দ্বারই রুদ্ধ হয়ে যায় না বরং সামগ্রিক দিক থেকে একটি ঐক্যের সোপানও তৈরি হয়। যার তত্ত্বাবধানে সকল ফিকহ ও ফিকহী স্তরসমূহ কেবলমাত্র গ্রহণযোগ্যই সাব্যস্ত হয় না, বরং একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। যা এই মতাদর্শের পূর্ণতার প্রমাণ বহন করে (তারিখে দারুল উলূম, খ : ১ পৃ : ২৮-২৯)।

ফিকহি মতবিরোধ সম্পর্কে রাবেতা আলমে ইসলামীর সিদ্ধান্ত :

হে জাতির কাণ্ডারী উলামায়ে কেরাম! ভারসাম্যপূর্ণ নীতির বিবরণ তো আমাদের বড়দের লেখা দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে। এখন "রাবেতা আলমে ইসলামীর ফিকহি কাউন্সিলের একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা সমুচিত মনে করছি। যেন যারা সৌদি উলামায়ে কেরামের নাম নিয়ে সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে তাদের ভ্রান্তি উন্মুচিত হয়ে যায়। এ কথাও প্রমাণিত হয় যে সৌদি উলামায়ে কেরামগণ ইমামগণের অনুসরণকারীদের সম্পর্কে গায়রে মুকাল্লিদদের এই কর্মপন্থাকে অযৌক্তিক ও বাতিল মনে করেন।
বিগত ২৪ থেকে ২৮ সফর ১৪০৮ হিজরী মোতাবেক ১৭ থেকে ২১ অক্টোবর ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত রাবেতা আলমে ইসলামীর দশম সেমিনারে "ফিকাহ কাউন্সিল" প্রস্তাবটি উত্থাপন করে অনুমোদন দেয় এবং তা তাদের মুখপাত্র "আখবারে আলমে ইসলামী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ওই প্রস্তাবে সর্বপ্রথম আকিদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শ সম্পর্কীয় মতানৈক্যের ওপর দুঃখ প্রকাশ করা হয়। এবং গোটা উম্মতে মুসলিমাহকে "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে"র পতাকাতলে সমবেত হওয়ার অনুরোধ করা হয় এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আদর্শে আদর্শবান হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়। অতঃপর ইমামগণের ফিকহি মতানৈক্যকে তাঁদের জ্ঞান-গবেষণার সুফল ও উম্মতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ করুণা ও রহমত গণ্য করে বিষয়টির ওপর অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ মতামত প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবটি খুবই দীর্ঘ, এখানে জরুরি অংশ উল্লেখ করা হচ্ছে :

فهذا النوع الثانى من اختلاف المذاهب، وهو الاختلاف الفقهى، ليس نقيصة، ولا تناقضاً فى ديننا، ولا يمكن أن لا يكون، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعى كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهى الاجتهادى.
فالواقع أن هذا الاختلاف، لا يمكن أن لا يكون، لأن النصوص الأصلية، كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى واحد، كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة، لأن النصوص محدودة، والوقائع غير محدودة، كما قال جماعة من العلماء -رحمهم الله تعالى -فلا بد من اللجوء إلى القياس، والنظر إلى علل الأحكام، وغرض

অনুবাদ : মাযহাবি মতানৈক্যের দ্বিতীয় পন্থা, তথা ফিকহি মতবিরোধ আমাদের দ্বীন অপূর্ণ কিংবা ঘাটতি হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। এ ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি হবেই। পৃথিবীতে এমন কোনো সম্প্রদায় পাওয়া যাবে না, যাদের নিকট আইন তৈরি করার জন্য গবেষণাভিত্তিক ফিকহি ইজতিহাদের (গবেষণার) ব্যবস্থা থাকবে আর সেখানে মতানৈক্য হবে না। মূলত এমন মতবিরোধ সৃষ্টি না হওয়াই অসম্ভব। কেননা অনেক ক্ষেত্রে শরীয়তের "নস" বা টেক্সে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে এবং "নসে" সম্ভাব্য সকল সমস্যার উল্লেখও সম্ভব নয়। কেননা মূলপাঠ (টেক্স) সীমিত আর ঘটনাপ্রবাহ অসীম, (আলেমগণ এমনই বলেছেন) সুতরাং কিয়াস করা (অনুমান করা) শরয়ী বিধিনিষেধের কারণ বের করা, শরীয়ত প্রবর্তকের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা, শরীয়তের ব্যাপক লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিত্যনতুন সমস্যার সমাধান বের করা ব্যতীত বিকল্প কোনো পন্থা পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে আলেমগণের মেধা ও প্রতিভার ব্যবধানের কারণে এবং বিভিন্ন সম্ভাবনা থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। অথচ তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন, অর্থাৎ সত্য অনুসন্ধান করে বের করা। সুতরাং যিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তিনি দুটি প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন। আর যিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন না, তিনিও একটি প্রতিদানের উপযুক্ত হবেন। এটি এমন একটি নীতিমালা, যা দ্বারা উদারতার সুযোগ সৃষ্টি হয় সংকীর্ণতার নয়। অতএব এরূপ মতানৈক্য দূষণীয় নয়, বরং তা উত্তম ও বরকতময়। আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি যে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈমানদারের জন্য অনুগ্রহ ও অনুকম্পাস্বরূপ এবং তা হলো নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে বড় ধরনের পুঁজি হিসেবে কাজ করে। বস্তুত তা এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যার ওপর জাতি অহংকার করতে পারে। কিন্তু পথভ্রষ্টকারী লোকেরা ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় অপরিপক্ব মুসলিম যুবকদের দুর্বলতাকে কাজে লাগানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বিশেষত যে সকল যুবকরা উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করছে তারা তাদের সামনে এই মতানৈক্যকে আদর্শিক মতানৈক্য হিসেবে চিত্রায়িত করছে। তাদের বাড়াবাড়ি ও মিথ্যা বর্ণনা সীমা ছাড়িয়ে গেছে, এমনকি ওই যুবকদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে এরূপ মতানৈক্য শরীয়ত অপূর্ণ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। অনুরূপভাবে তারা উভয় প্রকার মতানৈক্যের মধ্যে পার্থক্য করে না। অথচ (আদর্শিক মতানৈক্য ও ফিকহি মতানৈক্য) উভয় প্রকার মতানৈক্যের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : যে সম্প্রদায় সকল মাযহাব বর্জনীয় মনে করে এবং মানুষ নিজ নিজ গবেষণা দ্বারা সমাধান বের করতে সক্ষম জ্ঞান করে এবং প্রচলিত মাযহাব ও তার সকল ইমাম বা কিছু কিছু ইমামের সমালোচনা করে; তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য যে মাযহাব সম্পর্কে

আমাদের এই স্পষ্ট বিবরণ ও মাযহাবের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য এবং ইমামগণের মর্যাদা সম্পর্কীয় আলোচনার পর তারা যেন সেই শত্রুতামূলক আচরণ পরিহার করে, যা তারা গ্রহণ করেছে, মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে এবং মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করছে। অথচ বর্তমান সময়ে ইসলাম বৈরী শক্তির চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া অন্য সকল সময়ের চেয়ে অধিক জরুরি, ফাটল সৃষ্টিকারী কোনো সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নয়।

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম!

উল্লিখিত বিবরণ এটি প্রমাণ করার জন্য

الشارع، والمقاصد العامة للشريعة، وتحكيمها في الوقائع، والنوازل المستجدة .وفي هذا تختلف فهوم العلماء، وترجيحاتهم بين الاحتمالات، فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد، وكل منهم يقصد الحق، ويبحث عنه، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج.

فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي، الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة، وأنه في الواقع نعمة، ورحمة من الله بعباده المؤمنين، وهو في الوقت ذاته، ثروة تشريعية عظمى، ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية .ولكن المضللين من الأجانب، الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم، ولا سيما الذين يدرسون لديهم في الخارج، فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافا اعتقاديا، ليوحوا إليهم ظلما وزوراً بأنه يدل على تناقض الشريعة، دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان ما بينهما.

ثانيا :وأما تلك الفئة الأخرى، التي تدعو إلى نبذ المذاهب، وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها، وتطعن في المذاهب الفقهية القائمة، وفي أئمتها أو بعضهم، ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية، ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه، ويضللون به الناس، ويشقون صفوفهم، ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أعداء الإسلام، بدلا من هذه الدعوة المفرّقة التي لا حاجة إليها.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.

যথেষ্ট যে গায়রে মুকাল্লিদদের চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা উভয়টি উম্মতের সকল উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে অবৈধ ও ভিত্তিহীন। তাই বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা তা বাস্তবায়নের জন্য সদা প্রস্তুত থাকব। যেন গোটা মুসলিম উম্মাহ তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায় এবং নিজেদের পূর্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণের পরিবেশ অক্ষুণ্ন থাকে। এখন আমাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। অতএব উক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে যে কর্মসূচি নির্ধারিত হবে আমারা সকলেই তা কার্যকর করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকব, ইনশাআল্লাহ। এই প্রেক্ষাপটে ভাই হিসেবে একটি আবেদন রাখতে চাই, মূলত এ কাজটি আমাদেরকে আঞ্জাম দিতে হবে পূর্ণ দরদ ও ব্যথা, নিষ্ঠা ও একনিষ্ঠতা এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান-গবেষণার সাথে। এবং সদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, মুসলিম উম্মাহ যেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী জনগোষ্ঠীর হাত থেকে পূর্ণ নিরাপদ থাকে। প্রকৃতপক্ষে পূর্বসূরিদের কর্মপদ্ধতির স্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং তা দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের মিশন ও মূল টার্গেট।

পরিশেষে আবারো আপনাদের আপ্যায়নে ত্রুটির জন্য আন্তরিকভাবে অপরগতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন যাপন করার তাওফিক দান করুন এবং এই সভাকে উত্তম ফলদায়ক ও বরকতময় করুন। আমীন।

'তাহাফফুজে সুন্নাত' শীর্ষক কনফারেন্সের বিশেষ ঘোষণা :

উলামায়ে কেরামের এই কনফারেন্স দেশ-বিদেশের চলমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আকিদা-বিশ্বাস, আস্থা ও অভিমত প্রকাশ করা জরুরি মনে করছে। নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কেরামের দল হলো হেদায়েতপ্রাপ্ত অনুসরণীয় একটি জামাত। তাদের বর্ণনাকৃত হাদীস শরীফ উম্মতের জন্য হুজ্জত-প্রামাণ্য ও অনুকরণীয়, তা থেকে বিমুখ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাদের বুদ্ধি ও উপলব্ধি এবং তাদের দেওয়া কোরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উম্মতের জন্য আদর্শ। সাহাবায়ে কেরামের যুগে যে সকল বিষয় ইজমার ভিত্তিতে চূড়ান্ত হয়েছে তা পরবর্তী উম্মতের জন্য প্রামাণ্য, কেউ তা উপেক্ষা করতে পারবে না। সে সকল বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে সে সম্পর্কে পরবর্তী উম্মতগণ যেকোনো একটি মতকে গ্রহণ করতে পারবে। তবে সাহাবায়ে কেরামের সবকটি মতামতকে বাদ দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে নতুন কোনো অভিমত সৃষ্টি করতে পারবে না। অনুরূপভাবে যে সকল মাসআলায় ইমাম চতুষ্ট [ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম আহমদ (রহ.)] ঐকমত্য পোষণ করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করে নতুন মতামত সৃষ্টি করা; ধর্মীয় বিষয় সাব্যস্ত হবে না বরং ধর্মহীনতা প্রমাণ করবে।

এই কনফারেন্স এ বিষয়টিও ঘোষণা করা জরুরি মনে করছে যে, মুজতাহিদ ইমামগণ, ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণের জ্ঞান-গবেষণা ও ইলমি খিদমাতগুলো ইসলাম ধর্মের জন্য বড় ধরনের পুঁজি। তার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস জাতির জন্য সফলতা ও কামিয়াবীর মাধ্যম। উলামায়ে হিন্দের এই কনফারেন্স গভীরভাবে উপলব্ধি করছে যে ইসলামবিদ্বেষী মুসলিম বৈরী শক্তি, বিশেষত ইউরোপ-আমেরিকা বর্তমান সময়ে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কোণঠাসা করার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এমন কঠিন মুহূর্তে গোটা ইসলামী শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে এই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের প্রতিরোধে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা অত্যন্ত জরুরি। তবে পরিতাপের বিষয়, গায়রে মুকাল্লিদ সম্প্রদায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা তো দূরে থাক, হীন উদ্দেশ্যে স্বয়ং মুসলমানদের বিরুদ্ধে চতুরমুখী ষড়যন্ত্রের দ্বার উন্মুক্ত করে রেখেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদেরকে দ্বীন থেকে বহিষ্কার ও বাতিল করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, সৌদি সরকার তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে। সৌদি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের "তাওতিআতুল জালিয়াত" (সম্প্রদায় সমীকরণ বিভাগ) ইমামদের অনুসরণকারী মুসলমান, বিশেষত হানাফী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করছে এবং তাদের নামে দুর্নামি রটাচ্ছে। বস্তুত সৌদি সরকার অতীতে মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে এবং বর্তমানেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম; তবে তারা আজ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিবাদ এবং অনৈক্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের এই তৎপরতা একদিকে মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং অন্যদিকে স্বয়ং সৌদি সরকারের জন্যও কল্যাণকর নয়।

আজকের কনফারেন্স সৌদি সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছে, সরকার যেন এ বিষয়টি তদন্ত করে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

"তাহাফফুজে সুন্নাহ" শীর্ষক মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবনা :

দারুল উলূম দেওবন্দের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই "তাহাফফুজে সুন্নাহ" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছে যে উম্মতে মুসলিমার জন্য একমাত্র হেদায়েতের পথ হলো "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের" সেই পথ, যার বিবরণ হাদীস শরীফে ماأناعليه واصحابى "আমার ও আমার সাহাবায়ে কেরামের পথ" বলে ব্যাপক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুজতাহিদ ইমামগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আলোকে কোরআন-হাদীসের ওপর আমল করা এবং ইমামগণ ও পূর্বসূরিদের আদর্শকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা, যা যুগ যুগ ধরে সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত গ্রহণ করে আসছে। নিঃসন্দেহে বর্তমানে সর্বাঙ্গীনভাবে এর ওপর অধিষ্ঠিত আছেন দারুল উলূম দেওবন্দের উত্তরসূরিগণ এবং তাঁদের মাধ্যমেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

হেদায়েতের এই পথ থেকে উম্মতে মুসলিমাহকে বিপদগামী করার অপপ্রয়াস; যা বিগত দেড় শতাব্দী ধরে চলছে তার বর্তমান নেতৃত্ব দিচ্ছে "গায়রে মুকাল্লিদরা", তারা উলামায়ে কেরাম থেকে উম্মতের সম্পর্ক ছিন্ন ও দুর্বল করার অপচেষ্টা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে এক শ্রেণীর লোক এই নতুন চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হচ্ছে। অতএব এই নব-আবিষ্কৃত মতবাদের অনিষ্ট থেকে গোটা জাতিকে রক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসার পরিচালকগণের অবশ্য কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আজকের কনফারেন্স নিম্নের প্রস্তাবনাগুলো গ্রহণ করেছে। আশা করছে, উলামায়ে কেরাম, মাদরাসার জিম্মাদারগণ এবং দ্বীনের সকল দায়িত্বশীলগণ উক্ত প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন।

১. ছাত্রদেরকে এ বিষয়ে পারদর্শী করার লক্ষ্যে সকল বড় বড় মাদরাসা, দারুল উলূম দেওবন্দের ন্যায় সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাখাচ্ছুসাত ও দাওরায়ে হাদীসের ছাত্ররা অবশ্যই সেখানে অংশগ্রহণ করবে।

২. মনোনীত শিক্ষকমণ্ডলীকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩. দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে বড় বড় মাদরাসায় অভিজ্ঞ ও পারদর্শী বক্তা ও মুবাল্লিগ নিয়োগ দেওয়া; যাঁরা আন্তরিকতা ও সচেতনতার সাথে জিম্মাদারি পালনে সচেষ্ট হবেন।

৪. এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা, যেন মাদরাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও স্থানীয় আলেমগণ এ বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেন।

৫. যে সকল মাসআলা নিয়ে গায়রে মুকাল্লিদরা বির্তক করে, তার ওপর দলিল সহকারে সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা প্রকাশ করা এবং ব্যাপকহারে তা বিতরণের ব্যবস্থা করা।

৬. বিভিন্ন স্থানে "মজলিসে তাহাফফুজে শরীয়ত" (শরীয়ত সংরক্ষণ কমিটি) নামে একটি কমিটি গঠন করা; যা গায়রে মুকাল্লিদসহ অন্যান্য বাতিল সম্প্রদায়ের মুখোশ উন্মুচনে কাজ করবে।

৭. যে সকল সাধারণ মুসলমান ও জেনারেল শিক্ষিত লোকেরা গায়রে মুকাল্লিদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে তাদেরকে সঠিক চিন্তাধারা সম্পর্কে অবগত করা, ব্যক্তিগত উদ্যোগে হোক কিংবা সাধারণ সভা-সম্মেলনের মাধ্যমে।

৮. ইমামগণ প্রয়োজনীয় স্থানে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং মসজিদ কমিটি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

৯. ছাত্রদের মধ্যে হাদীস মুখস্থ করার ধারা চালু করা এবং তাদের মধ্যে মাযহাব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা সৃষ্টি করা।

১০. এই কনফারেন্স দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শূরার নিকট দারুল উলূমের সক্রিয় বিভাগ "তাহাফফুজে সুন্নাত"-কে সম্প্রসারিত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছে। যেন তা দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যক্তি গঠনের কাজ করার সুযোগ হয়।

১১. দারুল উলূম দেওবন্দের নেতৃত্বে শীর্ষ আলেমগণের একটি প্রতিনিধিদল সৌদি আরব সফর করবেন। তাঁরা সৌদি সরকার ও সেখানকার উলামা-মাশায়েখগণকে এখানকার চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করবেন এবং ঘোষণাপত্র অনুযায়ী এই কনফারেন্সের লোকসমাগম ও মানুষের আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে সৌদি সরকারকে অবগত করবেন যে গায়রে মুকাল্লিদরা সৌদি উলামায়ে কেরামের নাম নিয়ে মানুষদের পথভ্রষ্ট করছে। সেখান থেকে অর্জিত সম্পদের অপব্যবহার করছে। সৌদি সরকারও সেখানকার উলামা-মাশায়েখকে "আহলে হক্ব" থেকে দূরে সরানোর জন্য মিথ্যা ষড়যন্ত্র করছে এবং তারা "তাওলিআতুল জালিয়াত"-এর প্রচার বিভাগকেও অপব্যবহার করছে। তাতে একদিকে সৌদি সরকারের দুর্নাম হচ্ছে, অন্যদিকে উম্মতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে। অতএব সৌদি সরকারের জন্য উচিত হবে, তারা যেন সালফে সালেহীনের পথচ্যুত এই সম্প্রদায়ের সহযোগিতার স্থলে বিষয়টির খোঁজখবর নেয় ও তাদের কার্যক্রমের যথাযথ দেখাশোনা করে।

(সমাপ্ত)

মেয়েদের বিয়ের বয়স ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবাহ

মাওলানা কাসেম শরীফ

বিবাহ মানবসমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। যুগে যুগে প্রতিষ্ঠানটি এর আদি রূপ থেকে বর্তমান কাঠামোয় উপনীত হয়েছে। বিবাহ প্রথাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে প্রধানত ধর্ম। বিয়েসংক্রান্ত সব নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ হয়েছে ধর্মীয় অনুশাসনে। এ কথা সব ধর্মের জন্যই প্রযোজ্য। বিয়ের প্রথা, পদ্ধতি, বয়স, রীতিনীতি–সবই যুগে যুগে পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সেটা হয়েছে ধর্ম ও সংস্কৃতির হাত ধরে। বিয়ের ক্ষেত্রে যুগে যুগে দেশে দেশে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। ভিন্ন ভিন্ন বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো বিধান ও সংস্কৃতির ব্যাপারে কোনো যুগের মানুষই এ প্রশ্ন তোলেনি যে 'কেন এই বিধান দেওয়া হলো' বা 'অমুক বিধান ও সংস্কৃতি অবৈধ'। আদম (আ.)-এর যুগে নিজ মাতৃজাত বোনকে বিয়ে করা বৈধ ছিল। তাঁর পরের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নিজ মাতৃজাত বোনকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হযরত আদম (আ.)-কে এক হাজার বছর বয়স দেওয়া হয়েছিল। রুহের জগতে দাউদ (আ.)-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজের বয়স থেকে ৪০ বছর তাঁকে দান করেন। অবশিষ্ট ৯৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৩০৭৬)

ফলে আদম (আ.)-এর বৈবাহিক জীবনের স্থায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। কিন্তু পরে বনী আদমের বয়স কমতে থাকে। কমতে কমতে গড়ে ৬০ থেকে ৭০-এ পৌঁছে যায়। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৫৫০, ২৩৩১; ইবনে মাজা, হাদীস নং-৪২৩৬)

তাই পরবর্তী লোকদের বিয়ের বয়স, পারিবারিক জীবনের স্থায়িত্ব, বিয়ে প্রথা ও বিয়ের সংস্কৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাকে সামনে রেখে আমরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিয়ে নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ট। তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। মহানবী (সা.) থেকে তিনি ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কেবল হাদীসই বর্ণনা করেননি, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা দিতেন, ফতোয়া দিতেন। মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর বরকতময় বিয়ের সবচেয়ে বড় সুফল হলো, তাঁর মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তের এক-চতুর্থাংশ জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত জীবনীকার আল্লামা যুহুরি (রহ.) লিখেছেন : 'যদি আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানভাণ্ডার একদিকে একত্রিত করা হয় আর অবশিষ্ট নবীপত্নীদের জ্ঞান ও গোটা মুসলিমসমাজের নারীদের জ্ঞান অন্যদিকে একত্রিত করা হয়, তাহলে আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞান তাদের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম বলে বিবেচিত হবে।' (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২/১৪১)

তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা। হযরত আয়েশা (রা.) ইসলামের ইতিহাসের এমন ব্যক্তিত্ব, যাঁর চারিত্রিক উৎকর্ষতা বর্ণনা করে পবিত্র কোরআনে অনেকগুলো আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, '(পৃথিবীর ইতিহাসে) পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল তিনজন নারী পূর্ণতা ও সফলতা লাভ করেছে। এক. মারিয়াম বিনতে ইমরান। দুই. ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। তিন. আয়েশা (রা.)। নারীদের মধ্যে আয়েশা তেমনি শ্রেষ্ঠ, খাবারের মধ্যে যেমনি শ্রেষ্ঠ ছরিদ (আরবের বিখ্যাত খাবার)।' (বুখারী শরীফ, হাদীস নং : ৩৪১১)

তাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'হে আয়েশা! ইনি জিব্রাঈল, ইনি তোমাকে সালাম জানিয়েছেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

তাঁর পবিত্র রানের ওপর মাথা রেখে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ইন্তেকাল করেছেন। তিনি যে কক্ষে থাকতেন, সেটিকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জান্নাতের মুখ সেদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানেই শায়িত আছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

মহানবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবন

মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে কত বছর বয়সে বিয়ে করেছেন, কখন থেকে তাঁর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তা জানার আগে এ বিষয়টি ভালোভাবে হৃদয়াঙ্গম করা দরকার যে মহানবী (সা.) পূর্ণ যৌবনে পচিশ বছর বয়সে সর্বপ্রথম বিয়ে করেছেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম খাদিজাতুল কোবরা (রা.)। মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে তাঁর আরো দুটি বিয়ে হয়েছিল। এ দুই স্বামীর ঘরেই অন্তত চারজন সন্তান ছিল। সে সময় হযরত খাদিজা (রা.)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর, মতান্তরে ৪৫। আল্লামা জাহাবী (রহ.) এর মতে তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। (সিয়ারু আ'লামিন্ নুবালা

১/২৬৬) তিনি ছিলেন মহানবী (সা.) থেকে ১৫ বা ২০ বছরের বড়। তাঁর সঙ্গে মহানবী (সা.) ২৫ বছর ঘর-সংসার করেছেন। এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর মহানবী (সা.) হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রা.)-কে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন সাকরান ইবনে আমরের স্ত্রী। সাকরানের মৃত্যুর পর মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

মক্কা থেকে মদিনায় ইতিহাসখ্যাত হিজরতের মাত্র তিন বছর আগে হজরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়। এ সময় নবী করিম (সা.-)এর বয়স ছিল পঞ্চাশের কাছাকাছি। খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই ছিলেন নবী (সা.)-এর একমাত্র স্ত্রী। খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন। তাঁদের অনেকেই ছিলেন বিধবা বা যুদ্ধে স্বামীহারা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা কিংবা দুস্থ। কোনো কোনো বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় আল্লাহপাকের সরাসরি নির্দেশে। মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীদের নামের তালিকা নিচে রয়েছে–

১. হজরত খাদিজা (রা.) : নবী করীম (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী। তিনি বিধবা, তবে বিদুষী, ধনী নারী ছিলেন। পবিত্র মক্কায় তিনি 'তাহেরা'–অর্থাৎ পবিত্র বলে পরিচিত ছিলেন। নবী (সা.)-এর চেয়ে কমপক্ষে ১৫ বছরের বড় ছিলেন তিনি। নবুয়তের প্রথম জীবনে নবী (সা.)-এর দাওয়াতের কাজে তিনি বিশেষভাবে পাশে দাঁড়ান।

২. সাওদা বিনতে জাম'আ (রা.) : প্রথমে সাকরান ইবনে আমরের স্ত্রী ছিলেন। সাকরানের মৃত্যুর পর নবী (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

৩. আয়েশা (রা.) : আবু বকর (রা.)-এর কন্যা। কেবল আয়েশা (রা.)-ই কুমারী মেয়ে ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর বিয়ে হয়েছিল। নবী (সা.)-এর ওফাতের সময় আয়েশা (রা.)-এর বয়স ছিল ১৮ বছর। নবী (সা.)-এর বহু হাদীস আয়েশা (রা.)-এর মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছেছে। তাঁর প্রখর স্মরণশক্তি এ কাজে সহায়ক হয়েছিল।

৪. হাফসা (রা.) : ওমর (রা.)-এর কন্যা ছিলেন তিনি। প্রথম জীবনে উনাইস ইবনে হোজাফা (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। উনাইস (রা.) যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর নবী (সা.) তাঁকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করেন।

৫. জয়নাব বিনতে খুজাইমা (রা.) : তিনি মদিনায় নিঃস্বদের জননী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁর বিয়ে হয়েছিল তোফায়েল ইবনে হারিছের সঙ্গে। তালাকপ্রাপ্তা হয়ে তোফায়েলেরই ভাই উবায়দাকে বিয়ে করেন তিনি। উহুদের যুদ্ধে উবায়দা শহীদ হন। পরে অসহায় জয়নাবকে বিয়ে করেন নবী (সা.)। কিন্তু বিবাহিত জীবনের ছয় মাসের মধ্যেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়।

৬. সালামা (রা.) : প্রথম জীবনে তাঁর বিয়ে হয়েছিল আবু সালামা (রা.)-এর সঙ্গে। উহুদের যুদ্ধে আবু সালামা (রা.) শহীদ হন। বিধবা উম্মে সালামাকে অবশেষে নবী (সা.) স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নেন। ইতিহাসবিদরা বলেন, নবী (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই সবার শেষে মৃত্যুবরণ করেন।

৭. জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) : তিনি ছিলেন নবী (সা.)-এর ফুফাতো বোন। নবী (সা.) প্রথমে তাঁর এই বোনকে তাঁর পালকপুত্র জায়েদ (রা.)-এর সঙ্গে বিয়ে দেন। এই বিয়েতে গোড়া থেকেই জয়নাব (রা.)-এর আপত্তি ছিল। ফলে তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। পরে তাঁদের পারিবারিক জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে। জয়নাব (রা.)-এর আপত্তিতে এ বিয়ে সংঘটিত হওয়ায় এবং পরে বিচ্ছেদ ঘটায় নবী (সা.)-এর মনে কিছুটা অনুশোচনা আসে। এ থেকে জয়নাব (রা.)-কে নিজে বিয়ে করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেও তৎকালীন আরবের কুসংস্কারের জন্য তা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। পরে পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাবে আয়াত নাজিল হয়। সেখানে পালক ছেলে ঔরসজাত সন্তান সমতুল্য নয় বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। ফলে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কুসংস্কার নির্মূল করার উদ্দেশ্যে নবী (সা.)-এর মাধ্যমে সেই বিধান বাস্তবায়ন করে দেখানোর প্রয়োজন অনুভূত হয়। তখনই জয়নাব (রা.)-এর সঙ্গে নবী (সা.)-এর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

৮. জুওয়াইরিয়া (রা.) : একটি আরব গোত্রের সরদার হারিছের কন্যা। তিনি যুদ্ধে বন্দিনী হয়ে আসেন। মহানবী (সা.) তাঁকে মুক্ত করে তাঁর সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হন। উপহার হিসেবে গোত্রের সব বন্দি মুক্তি লাভ করে। তাঁর পিতা হারিছও ইসলাম গ্রহণ করেন।

৯. উম্মে হাবিবা (রা.) : মহানবী (সা.)-এর চাচা আবু সুফিয়ানের কন্যা। প্রথমে উবায়দুল্লাহ বিন জাহালের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। দুজনই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আফ্রিকার হাবশায় হিজরত করেন। কিন্তু সেখানে উবায়দুল্লাহ খ্রিস্টান হয়ে যায়। উবায়দুল্লাহ থেকে উম্মে হাবিবাকে মুক্ত করে তিনি হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশির মাধ্যমে চাচাতো বোন উম্মে হাবীবা (রা.)-কে বিয়ে করেন।

১০. সাফিয়্যা (রা.) : তিনি ছিলেন নবীদেরই বংশধর। হজরত মুসা (আ.)-এর ভাই হজরত হারুন (আ.)-এর অধস্তন বংশধারার কন্যা। প্রথমে কিনানা ইবনে আবিলের স্ত্রী ছিলেন তিনি। কিনানার মৃত্যুর পর মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

১১. মায়মুনা (রা.) : তিনি প্রথমে মাসউদ বিন ওমরের স্ত্রী ছিলেন। সে তালাক দিলে আবু রিহামের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আবু রিহাম মারা যাওয়ার পর মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। মহানবী (সা.)-এর এত বেশি বিয়ে আজকের যুগে অস্বাভাবিক মনে হলেও

তৎকালীন আরব জগতে এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। এ ছাড়া আগের নবীদের ইতিহাসে দেখা যায়, সুলায়মান (আ.)-এর ৭০০ স্ত্রী ছিল, দাউদ (আ.)-এর ৯৯ জন এবং ইবরাহিম (আ.)-এর ৩ জন, ইয়াকুব (আ.)-এর ৪ জন, মুসা (আ.)-এর ৪ জন স্ত্রী ছিলেন। হিন্দুদের গ্রন্থ মনুসংহিতায় পাঁচজন স্ত্রী থাকার কথা উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণের ছিল শত পত্নী ও উপপত্নী। (মনুসংহিতা, অধ্যায় : ৯, শ্লোক : ১৮৩)

হাজার বছর আগে তৎকালীন আরবেও এমন বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর বিয়েগুলো প্রায় সবগুলোই মানবিক, একটি কোরআনের আয়াতের বাস্তবায়নে, দু-একটি ইসলামী শরীয়া বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেউ কেউ ছিলেন মহানবী (সা.)-এর বৃহত্তর পরিবারের সদস্য, ফুফাতো বোন, অথবা চাচাতো বোন। অনেক বিধবা-অসহায় নারীকে তিনি নিজ স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেছেন। একজন বাদে কেউই কুমারী ছিলেন না; বরং মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে অনেকের বিয়ে হয়েছিল, যাঁদের অনেক সন্তান ছিল, তা নিয়েই। ওমর (রা.) তাঁর তালাকপ্রাপ্তা দুঃখিনী মেয়েকে বিয়ে করার জন্য অনেকের কাছেই যান, ব্যর্থ হয়ে ফেরার পথে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর কাছেই সমর্পণ করেন।

মহানবী (সা.)-এর এসব বিয়ের মধ্যে কোনো শারীরিক চাহিদাও ছিল না। বরং বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে তিনি বিয়ের মাধ্যমে একটি শক্তি সমাবেশও করে থাকেন, যা দেখে তৎকালীন কাফের-মুশরিকরাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। ইসলামী শরীয়ায় এ জন্য শারীরিক প্রয়োজনে অধিক স্ত্রী রাখার প্রবণতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সীমারেখায় অনধিক চার স্ত্রী থাকলেও সবার অধিকার আদায় না করতে পারলে একাধিক বিয়েকে অন্যায় ও জুলুম বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিয়ে

মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিয়ের সময় তাঁর বয়স কত ছিল, এ যুগের কিছু ইতিহাসবিদের মধ্যে এ নিয়ে সন্দেহের অবতারণা করতে দেখা যায় এবং হাস্যকর কিছু যুক্তিও উপস্থাপন করতে দেখা যায়। তাদের একদলের অভিমত হলো, বিয়ের সময় আয়েশা (রা.)-এর বয়স ছিল ১৪ বছর। আর যখন তাঁর সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর দৈহিক সম্পর্ক হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল ১৭ থেকে ১৮ বছর। (দেখুন–আরবী পত্রিকা 'আশ্ শিরকুল আওসাত' : ৬-৯-২০০৮ও প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক শওকী জইফের গ্রন্থ 'মুহাম্মদ খাতামুল মুরসালীন' : পৃষ্ঠা-১৭১)

মূলত তারা পশ্চিমা ভাবাদর্শে লালিত, নয়তো হাদীসশাস্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

তবে আমরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিয়ের সময়ের বয়সের ব্যাপারে অসংখ্য হাদীসের সামনে ইতিহাসবিদদের অভিমতকে প্রাধান্য দিতে পারি না। আমরা মনে করি, এ বিষয়ে হাদীসের কথাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। যাঁর বিয়ে, তাঁর জবানেই শুনুন–হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। তারপর আমরা মদিনায় এলাম এবং বনু হারিস গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। পরে যখন আমার মাথার সামনের চুল জমে উঠল। সে সময় আমি একদিন আমার বান্ধবীদের সঙ্গে দোলনায় খেলা করছিলাম। তখন আমার মাতা উম্মে রুমান এসে আমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমি বুঝতে পারিনি, তাঁর উদ্দেশ্য কী? তিনি আমার হাত ধরে ঘরের দরজায় এসে আমাকে দাঁড় করালেন। আর আমি হাঁপাচ্ছিলাম। শেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হলো। এরপর তিনি কিছু পানি নিলেন এবং তা দিয়ে আমার মুখমণ্ডল ও মাথা মাসেহ করে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভেতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনসারি নারী ছিলেন। তাঁরা বললেন, কল্যাণময়, বরকতময় ও সৌভাগ্যমণ্ডিত হোক। আমার মা আমাকে তাঁদের কাছে দিয়ে দিলেন। তাঁরা আমার অবস্থান ঠিক করে দিলেন, তখন ছিল দ্বিপ্রহরের আগ মুহূর্ত। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখে আমি হকচকিয়ে গেলাম। তাঁরা আমাকে তাঁর কাছে তুলে দিল। সে সময় আমি ছিলাম নয় বছরের বালিকা। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং : ৩৮৯৪, ৩৮৯৬, ৫১৩৩, ৫১৩৪, ৫১৫৬, ৫১৫৮, ৫১৬০; মুসলিম শরীফ, হাদীস নং : ১৪২২)

হিশাম ইবনে উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী করীম (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের তিন বছর আগে খাদিজাহ (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়। তারপর দুই বছর বা এর কাছাকাছি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আয়েশা (রা.)-কে বিয়ে করেন। তখন তিনি ছিলেন ছয় বছরের বালিকা। তারপর নয় বছর বয়সে বাসর উদ্‌যাপন করেন।'(সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮৯৬)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর পিতা-মাতাই আয়েশা (রা.)-এর বিয়ে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে দিয়েছিলেন। কোনো মুসলিম কিংবা অমুসলিম এ বিয়ের প্রতিবাদ করেনি। কারণ সে সময় মেয়েদের এ বয়সেই সাধারণত বিয়ে দেওয়া হতো। এটাই ছিল স্বাভাবিক বিষয়। এর আসল কারণ হলো, সে সময় আরবের মানুষদের আয়ু ছিল কম। মানুষ ৪০-৬০ বছর বয়সেই সাধারণত মারা যেত। তাই প্রাকৃতিকভাবে ৯ বা ১০ বছরের মেয়েকে বিয়ে করাই ছিল

সে সময়ের স্বাভাবিক ঘটনা।

মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে প্রধানত তিনটি কারণে বিয়ে করেছিলেন।

এক. হযরত আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আত্মীয়তার বাঁধনে আবদ্ধ করা।

দুই. সব ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত যে আয়েশা (রা.) ছিলেন তৎকালীন আরবের অন্যতম মেধাবী নারী। তাই মহানবী (সা.) তাঁর মাধ্যমে ইসলামের বিধিবিধান, বিশেষ করে নারীদের একান্ত বিষয়াদি উম্মতকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

তিন. মহানবী (সা.) তাঁকে বিয়ে করেছেন ওহীর নির্দেশ অনুসরণ করে। ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিয়ে করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) তাঁকে বলেছেন, দুবার তোমাকে আমায় স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, তুমি একটি রেশমি কাপড়ে আবৃতা এবং (জিব্রাঈল) আমাকে বলছেন, ইনি আপনার স্ত্রী, আমি ঘোমটা সরিয়ে দেখলাম। দেখি সে মহিলা তো তুমিই। তখন আমি ভাবছিলাম, আল্লাহ তা বাস্তবায়িত করবেনই। (বুখারী, হাদীস নং : ৩৮৯৫, ৫০৭৮, ৫১২৫, ৭০১১, ৭০১২; মুসলিম, হাদীস নং : ২৪৩৮)

বিভিন্ন ধর্মে বিয়ের ন্যূনতম বয়স

ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে স্পষ্টভাবে বিয়ের ন্যূনতম বয়স খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আকার-ইঙ্গিত ও ঘটনাপ্রবাহের সূত্র ধরে তা নির্ণয় করারও অবকাশ আছে। ইসলাম ধর্ম মতে, প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের স্বাধীনভাবে বিয়ে করার অনুমতি আছে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ছাড়া ইসলামের বিধিবিধান পালন কারো জন্য বাধ্যতামূলক নয়। প্রাপ্তবয়স হলে মানুষের ওপর শরীয়তের বিধান অর্পিত হয়। এক আয়াতে আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়োপ্রাপ্ত হলে তারা যেন (ঘরে প্রবেশের আগে) অনুমতি প্রার্থনা করে, যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা।' (সূরা : নূর, আয়াত : ৫৯)

প্রাপ্ত বয়সের সীমারেখা কী–এ বিষয়ে অবশ্য কিছুটা মতপার্থক্য আছে। উপমহাদেশে প্রচলিত হানাফী মাযহাব অনুসারে ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর শরীরে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও বালক-বালিকা শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক বলে গণ্য হবে। (তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ই. ফা. খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৭)

এ বিষয়ে হাদীস শরীফে এসেছে : নাফে (রহ.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে পেশ করলেন, তখন তিনি চৌদ্দ বছরের বালক। (ইবনে ওমর বলেন) তিনি [মহানবী সা.)] আমাকে (যুদ্ধে গমনের) অনুমতি দেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধে তিনি আমাকে পেশ করলেন এবং অনুমতি দিলেন। তখন আমি পনের বছরের যুবক। নাফে (রহ.) বলেন, আমি খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে গিয়ে এ হাদীস শোনালাম। তিনি বললেন, এটাই হচ্ছে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়সের সীমারেখা। তারপর তিনি তাঁর গভর্নরদের লিখিত নির্দেশ পাঠালেন যে (সেনাবাহিনীতে) যাদের বয়স ১৫ হয়েছে, তাদের জন্য যেন ভাতা নির্দিষ্ট করেন। (বুখারী, হাদীস নং : ২৬৬৪, ৪০৯৭; মুসলিম, হাদীস নং : ১৮৬৮)

কিন্তু ইসলাম ধর্ম মতে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের অভিভাবক যদি তাঁদের সন্তানকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন, তাহলে বিয়ে বৈধ। কিন্তু সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এ বিয়ে ভেঙে দেওয়ার এখতিয়ার রাখবে, যদি পিতা ও দাদা ছাড়া অন্য কেউ বিয়ে দিয়ে থাকে। (হেদায়া : ১/১৯৩)

☆ রোমান ক্যাথলিকরা বিশ্বাস করে যে মরিয়ম (আ.)-এর বয়স ছিল ১১-১৪ বছর, যখন তিনি ঈসা (আ.)-কে জন্ম দিয়েছিলেন।

☆ তাওরাত বা ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা অনুসারে ইসহাক (আ.) ৪০ বছর বয়সে মাত্র তিন বছরের কন্যাশিশুকে বিয়ে করেছেন। সেখানে আছে : 'ইসহাক ৪০ বছর বয়সে রেবেকাকে বিয়ে করেছেন। রেবেকা ছিলেন পদ্দম-ইরাম দেশের সিরীয় বথুয়েলের মেয়ে এবং সিরীয় লাবনের বোন।' (তাওরাত, সৃষ্টি অধ্যায়, ২৫ : ২০)

ইসহাক (আ.)-এর অন্য নাম হলো ইসরাঈল। তাঁর বংশ থেকেই ইহুদী ও খ্রিস্টানদের নবীদের আগমন ঘটেছে।

ইহুদীদের ধর্মীয় বিধানশাস্ত্র বিষয়ের গ্রন্থ হলো 'তালমূদ'। তালমূদের সানহাদরীনের বর্ণনা মোতাবেক উপদেশ নম্বার ৫৫-তে উল্লেখ আছে : 'ইহুদীদের জন্য তিন বছরের মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ।'

আর তালমূদের খুসুবুসের বর্ণনা অনুযায়ী উপদেশ নম্বার ৫৬-তে উল্লেখ আছে : 'শিশুর ৯ বছর হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ইহুদীদের জন্য বৈধ।'

তালমূদের বর্ণনাকারী সাঈদ রাবী জুসেফ লিখেছেন : 'এ কথা তোমার কাছে রেজিস্টার করে নাও যে কন্যাশিশুর বয়স তিন বছর এক দিন হলে তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব।' (বিস্তারিত দেখুন : Neusner, The Talmud of Babylonia, vol.B, Tractate Sanherdrin 1984)

উপমহাদেশে হিন্দুদের সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে প্রধানত মনুর বিধান অনুসারে। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, মেয়েদেরে আট বছর বয়সের মধ্যেই বিয়ে দিতে হবে। মনুশাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'কালেহদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ।/মৃতে ভর্তরি পুত্রস্ত বাচ্যো মাতুররক্ষিতা।' অর্থাৎ বিবাহযোগ্য

সময়ে (ঋতুদর্শনের আগে) পিতা যদি কন্যাকে পাত্রস্থ না করেন, তাহলে তিনি লোকমধ্যে নিন্দনীয় হন। স্বামী যদি ঋতুকালে পত্নীর সঙ্গে সঙ্গম না করেন, তবে তিনি লোকসমাজে নিন্দার ভাজন হন। স্বামী মারা গেলে পুত্ররা যদি তাদের মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তাহলে তারাও অত্যন্ত নিন্দাভাজন হয়। (মনুসংহিতা : ৯/৪)

এখানে দেখা যাচ্ছে, একটি কুমারী কন্যা প্রজননযোগ্যা ঋতুমতী হয়েও প্রজননকাজে ব্যবহৃত না হওয়া মনুশাস্ত্রের লঙ্ঘন। সে ক্ষেত্রে যথাসময়ে পাত্রস্থ না করার কারণে কন্যার ওপর পিতার অধিকারও খর্ব হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, 'পিত্রে ন দদ্যাছুল্কন্ত কন্যামৃতুমতীং হরন্।/স হি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃতূনাং প্রতিরোধনাৎ।' অর্থাৎ ঋতুমতী কন্যাকে যে বিবাহ করবে, সেই ব্যক্তি কন্যার পিতাকে কোনো শুল্ক দেবে না। কেননা সেই পিতা কন্যার ঋতু নষ্ট করছেন বলে কন্যার ওপর তাঁর যে অধিকার, তা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। (মনুসংহিতা : ৯/৯৩)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিয়ের বাজারে কন্যার একটা বিনিময়মূল্য আছে, যা অধিকার হিসেবে পিতাই প্রাপ্ত হতেন। কিন্তু কন্যার ঋতু নষ্ট না করার সঙ্গে তা সম্পর্কিত। তাই সে বিনিময়মূল্য পেতে হলে কন্যাকে ঋতুবতী হওয়ার আগেই বিয়ে দিতে হবে।

বাল্মীকি রামায়ণের তৃতীয় খণ্ডের ৪৭ শ অধ্যায়ে সীতার বিবৃতি থেকে আমরা জানতে পারি যে সীতা অষ্টাদশ বছর বয়োক্রমকালে বিবাহের ত্রয়োদশ বছরে রামের বন গমনকালে তাঁর সঙ্গে অযোধ্যা ত্যাগ করেছিলেন। পাটিগণিতের সহজ হিসাব মতে, বিবাহের সময় সীতার বয়স পাঁচ-ছয় বছর ছিল। (মোহাম্মদ মতিয়র রহমান, প্রাচীন ভারতে বাল্য-বিবাহ, ১৫ শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৮, ১৯৪১)

যারা মহানবী (সা.) ও আয়েশা (রা.)-এর বিয়ে নিয়ে আপত্তি করেন, তাঁরা কিন্তু রাম আর সীতার বিয়ে নিয়ে টুঁ শব্দও করেন না। কারণ কী? কারণ, যাকে দেখতে নারী, তার চরণ বাঁকা।

বিভিন্ন দেশ ও সভ্যতায় নারীর বিয়ের বয়স

বিয়ের ক্ষেত্রে দেশ-জাতিভেদে আলাদা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। একজন মানুষ কোন বয়সে বিয়ে করছেন, তা নির্ভর করে ওই দেশের গড় আয়ের ওপর। দেখা যায়, ধনী ও নর্ডিক দেশ বা সুইডেনের মানুষ তিরিশের আগে বিয়ে করেন না। কিন্তু সেন্ট্রাল আফ্রিকায় বিয়ের গড় বয়স ২০। বিভিন্ন দেশের ২০০৯-২০১৪ সালের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে একটি জরিপ চালানো হয়। এ জরিপের নাম দেওয়া হয় 'মিন সিঙ্গুলেট এজ অ্যাট ম্যারিজ'। সেখানে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের হিসাব মতে, ৩৯টি দেশের ২০ শতাংশ নারী মাত্র ১৮ বছর বয়সে এবং ২০টি দেশে ১৫ বছর বয়সে বিয়ে করে ফেলেন। আবার দুটো দেশের ১০ শতাংশ পুরুষ মাত্র ১৮ তেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেন।

আবার পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে নারীদের বিয়ের বয়স বেড়েছে। সত্তর দশক থেকে ২০০০ নাগাদ এ বয়স ২১.৮ বছর থেকে ২৪.৭-এ উন্নীত হয়েছে।

[কালের কণ্ঠ অনলাইন : ৮ জুলাই, ২০১৬, ১৩:২৭ (সূত্র : বিজনেস ইনসাইডার)]

এখানে আমাদের এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে মহানবী (সা.)-এর সময়ে আরবের লোকদের গড় আয়ু ছিল ৪০ থেকে ৬০ বছর। তাই সে সময়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ছিল স্বতঃসিদ্ধ।

১৪০০ বছর তো অনেক দূরে, এই গত ১৮৮০ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের দেলোয়ারে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ছিল ৭ বছর। মাত্র ১৩০ বছর আগে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স কত ছিল? দেখুন–ডেনমার্ক-১২, ইংল্যান্ড-১৩, ফ্রান্স-১৩ পর্তুগাল-১২, রাশিয়া-১০, স্কটল্যান্ড-১২, স্পেন-১২, কানাডা-১২, আমেরিকার ফ্লোরিডা-১০, ক্যালিফোর্নিয়া-১০ বছর। লিস্টটা আরো অনেক বড়। আপনি চাইলে এখানে গিয়ে আরো দেখতে পারেন (http://chnm.gmu.edu/cyh/primary-sources/24)

বর্তমান পৃথিবীতেও এমন বহু দেশ আছে, যেখানে মেয়েদের বেশ কম বয়সে বিয়ে করা হয়। নিচের লিংকগুলোতে দেখুন :

- www.answering-christianity.com/gypsy_girl.htm
- www.answering-christianity.com/thai_girl.htm
- www.answering-christianity.com/aisha.htm#bible_prophets
- www.answering-christianity.com/aisha.htm#mary_age
- www.answering-christianity.com/aisha.htm#osama_bin_zaid
- www.answering-christianity.com/aisha.htm#middle_eastern_culture
- www.answering-christianity.com/aisha.htm#her_parents

তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার লোকেরা ও তাদের কেনা গোলামরা আয়েশা (রা.)-এর বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন তুললেও বৈধ পথ বাদ দিয়ে অবৈধ উপায়ে ঠিকই শিশুকন্যাদের ভোগ করছে। পরিসংখ্যান বলছে :

যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের শিকার হওয়াদের মধ্যে ৯১ শতাংশ মহিলা ও বাকি ৯ শতাংশ পুরুষ। প্রতি ৩ জনে একজন নারী ধর্ষিত হয়। ১৮ বছরের আগে ৪০ শতাংশ নারী এখানে ধর্ষণের শিকার হয়। প্রতি ১০৭ সেকেন্ডে একজন ধর্ষিতা হয় যুক্তরাষ্ট্রে। ১২-১৮ বছর

বয়সী ২ লাখ ৯৩ হাজার শিশু-কিশোরীর ধর্ষিত হবার তথ্য পাওয়া গেছে। এখানে ৬৮ শতাংশ ধর্ষণের রিপোর্ট হয় না। ৯৮ ভাগ ধর্ষকের শাস্তি হয় না। এমনকি কারাগারেও নারীদের স্বস্তি নেই। ২ লাখ ১৬ হাজার নারী প্রতিবছর কারাগারে ধর্ষিত হয়। যুক্তরাজ্যেও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে বিস্তর। তথ্য অনুযায়ী, বছরে প্রায় ৮৫ হাজার মহিলা ধর্ষিতা হন গ্রেট ব্রিটেনে। প্রতি বছর যৌন হয়রানির শিকার হন প্রায় ৪০ হাজার নারী। ইংল্যান্ড এন্ড ওয়ালসে প্রতিদিন ২৩০ জন ধর্ষিত হয়। প্রতি ৫ জন নারীর একজন ১৬ বছরের আগেই ধর্ষিত হয়। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকায় কমবয়সী ও শিশুকন্যার ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি। সে দেশে ধর্ষণের অপরাধে সাজাও কম। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে মাত্র ২ বছরের জেল দেওয়া হয়। এখানে প্রতিবছর ৫ লাখ ধর্ষণের মামলা হয়। ১১ বছরের নিচেই ১৫ শতাংশ মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়। ৫০ শতাংশ নারী ১৮ বছরের আগেই নিগৃহীত হয়। (দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ জুলাই, ২০১৫)

শুধু ধর্ষণ নয়, শিশুকন্যাদের বিয়েও রীতিমতো সিদ্ধ আধুনিক পৃথিবীতে। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বের ৪০ শতাংশ কন্যাশিশুদের বিয়ে হয় ভারতে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে বাল্যবিবাহের সংখ্যা ২ কোটি ৩০ লাখের মতো, যা বিশ্বের মোট বাল্যবিবাহের প্রায় ৪০ শতাংশ। (ডয়চে ভেলের বরাতে দৈনিক সংগ্রাম : ২৪-১১-২০১৬)

বর্তমান বিশ্বে ন্যূনতম কত বছর বয়সের নারীদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করা বৈধ, দেখুন–মেক্সিকোতে ১২, কুরিয়াতে ১৩, কানাডায় ১৪, সুইডেনে ১৫ বছর বয়সী মেয়েদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করা রীতিমতো আইনসিদ্ধ। (বিস্তারিত দেখুন : http://www.avert.org/sex-stis/age-of-consent)

এ ছাড়া আর্জেন্টিনায় ১৩, নাইজেরিয়ায় ১৩, প্যারাগুয়ে ও পেরুতে ১৪, সেনেগালে ১৩, স্পেনে ১৩, পোপের শহর ভ্যাটিক্যান সিটিতে ১২ বছর বয়সী মেয়েদের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা আইনসিদ্ধ। (বিস্তারিত দেখুন : http://chartsbin.com/view/hxj)

বাঙালি সংস্কৃতিতে নারীদের বিয়ের বয়স

১৯ শতকেও বাঙালি নারীদের ছোটবেলায় বিয়ে দেওয়া হতো। বাঙালির বিয়ের ইতিহাস বিষয়ে 'বাংলাপিডিয়া' লিখেছে :'১৯২১ সালের আদমশুমারিতে বিয়ের গড় বয়স মেয়েদের ১২ এবং ছেলেদের ১৩ বছর উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (Child Marriage Restraint Act) পাশ হয়। এ আইন অনুযায়ী ১৪ বছরের নিচের পাত্রী এবং ১৮ বছরের নিচের পাত্রের বিবাহ ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ।' (বিবাহ, বাংলাপিডিয়া)

কিন্তু তার পরও কি কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বন্ধ হয়েছে? সে বিয়ে কি পিতা-মাতার অসম্মতিতে বা আইনের বাইরে গিয়ে হয়েছে? আমরা দেখতে পাই, ইউনিসেফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'বাংলাদেশে ১৮ বছরের আগে ৬৬ শতাংশ মেয়ে এবং একই বয়সের ৫ শতাংশ ছেলের বিয়ে হচ্ছে। এর মধ্যে শতকরা ২৯ ভাগ মেয়েরই বিয়ে হয় ১৫ বছরের কম বয়সে আর শতকরা দুই ভাগ মেয়ের বিয়ে হয় ১১ বছরের কম বয়সে।' সেভ দ্য চিলড্রেন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ৬৯ শতাংশ নারীর ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।' (ইত্তেফাক ২০ ডিসেম্বর, ২০১৫)

'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' নামে একটি বই লিখেছেন কট্টর সেক্যুলার গোলাম মুরশিদ। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতিতে নারীদের বিয়ে কত বছর বয়সে হতো? তিনি লিখেছেন : 'দ্বারকানাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা) বিয়ে করেছিলেন পনেরো বছর বয়সে। চিন্তার দিক দিয়ে তিনি সে যুগের তুলনায় খুব আধুনিক থাকলেও তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথের বিয়ে দিয়েছিলেন সতেরো বছর বয়সে, পাত্রীর বয়স ছিলো এগারো।'

বাঙালি জাতির সবচেয়ে প্রাগ্রসর শিক্ষাবিদ হিসেবে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়, তাঁরা কত বছর বয়সী নারীদের বিয়ে করেছিলেন, ড. মুরশিদ লিখেছেন : বঙ্কিমচন্দ্র যাঁকে বিয়ে করেছিলেন, তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। দেবেন্দ্রনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর স্ত্রীর বয়স ছিল ছ বছর। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর বয়স ছিল সাত বছর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ত্রীর বয়স আট বছর, কেশব সেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ৯, শিবনাথ শাস্ত্রীর দশ আর রাজনারায়ণ বসুর স্ত্রীর বয়স ছিল এগারো বছর।'

(দেখুন : হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-২২০)

যাঁরা আয়েশা (রা.)-এর বিয়ের বয়স নিয়ে আপত্তি করেন, তাঁদের অনেকের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেবতাতুল্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে সব ক্ষেত্রে আদর্শ পুরুষ। তিনি কিন্তু ২৩ বছর বয়ছে মাত্র ১১ বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। ড. গোলাম মুরশিদই সে তথ্য উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশে নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার বিয়ে কত বছর বয়সে হয়েছিল? ১৮৯৬ সালে ১৬ বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয় ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে। বিয়ের পর তিনি 'বেগম রোকেয়া

সাখাওয়াৎ হোসেন' নামে পরিচিত হন। তাঁর স্বামীও মুক্তমনা মানুষ ছিলেন। (http://www.manobkantha.com/2013/12/09/150194.html)

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিয়ে হয়েছে ১৫ বছর বয়সে। প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী তাঁর জন্ম ১০৪৫ সালে, তাঁর বিয়ে হয়েছে ১৯৬০ সালে। (দেখুন : বাংলাপিডিয়া ইংরেজি সংস্করণ – http://en.banglapedia.org/index.php?title=Zia%2C_Begum_Khaleda)

সম্প্রতি আমাদের দেশে একটি আইন হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার বয়স ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে ন্যূনতম ১৩ বছর হতে হবে। (কালের কণ্ঠ : ৯ নভেম্বর, ২০১৬)

১৩ বছর বয়সেই যদি কেউ যোদ্ধা হতে পারে, দৈহিক মিলন করার জন্য কি তার বয়স ১৮ বা ২১ হতে হবে? বিয়ে বা দৈহিক মিলন কি যুদ্ধের চেয়েও কঠিন কাজ? না, কঠিন কাজ না। তাই তো জাতিসংঘ ও তার দোসররা ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে নিয়ে আপত্তি করলেও এ বয়সের মেয়েদের 'লাভ', অবৈধ দৈহিক মিলন ও 'ফ্রেন্ডশিপ'-এর প্রতি কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না।

এর ফলে প্রকারান্তরে অবাধ যৌনাচার, বেলাল্লাপনা ও লিভটুগেদারের প্রতি যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

উপমহাদেশে ১৮৬০ সালে এজ অফ কন্সেন্ট আইনে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স স্থির করা হয় ১০। ১৮৯২ সালে এই বয়স বেড়ে দাঁড়ায় ১২। ১৯২৯ সালে এটা আবার বেড়ে দাঁড়ায় ১৪। ১৯৫৫ সালে এটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮ বছর। সে আইন এখনো বলবৎ আছে।

তার মানে যুগে যুগে নারীদের গড় আয়ু ও পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বিয়ের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারতম্য দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে পরের আইনের আলোকে আগের আইনসিদ্ধ বিষয়কে বিচার করা অজ্ঞতা, মূর্খতা ও জ্ঞানপাপীতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ধরুন, আজ আপনি ২১ বছর বয়সে একটি ১৮ বছরের মেয়েকে বিয়ে করলেন। ঠিক ১০০০ বছর পর আইন হলো যে ছেলেদের বিয়ের বয়স ২৮ আর মেয়েদের ২৫। তখন কি ৩০১৬ সালের মানুষ আপনাকে–বাল্যবিবাহ আইন ভঙ্গ করেছেন–এমন অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারবে? কেন পারবে না? যদি না পারে, তাহলে আপনি কেন ১৪০০ বছর আগের আইনের আলোকে সংগঠিত হওয়া আয়েশা (রা.)-এর বিয়ে নিয়ে চিল্লাচিল্লি করছেন? নতুন আইনের আলোকে কেন পুরনো আইনের বিষয়কে বিচার করছেন? উদ্দেশ্য কী?

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেওয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেওয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেওয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রিম বা জামানত নেওয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম
বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০১২৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার : ০৮৬১২২০০০০৩১৪

সচ্ছল জীবনযাপন ও মহানবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

মুফতী আতীকুল্লাহ

ইসলামে দ্বীন ও দুনিয়ার, ইবাদত ও আদতের মধ্যে পার্থক্য সাধারণত নিয়্যাতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। নিয়্যাত যদি রেজায়ে মাওলা তথা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হয় তবে দুনিয়া ও আদতও (অভ্যাস) ইবাদত ও দ্বীনি কাজে পরিণত হয়, অন্যথায় দ্বীনও দুনিয়াতে পরিণত হয়ে ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা হারায়। এ জগতে জীবন যাপন করার জন্য ইসলামের কিছু মূলনীতি-আদর্শ রয়েছে, যা থেকে বিচ্যুতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মানব সমাজের জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ-পদ্ধতির প্রণয়ন করা হয়েছে। কিছু উপায়-উপকরণকে গ্রহণ করা ফরয ও বাধ্যতামূলক আর কিছু বৈধের পর্যায়ভুক্ত। মর্যাদাপূর্ণ ও সুষ্ঠু-সচ্ছল নিরাপদ জীবনের জন্য হালাল পন্থায় জীবনোপকরণ ও অর্থোপার্জন করা অপরিহার্য ও ফরয করা হয়েছে। সাথে সাথে প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল-দৌলত, ধন-সম্পদ উপার্জন করাও বৈধ ও অনুমোদিত। তা কোনোভাবেই অনৈসলামিক নয় আবার তাকওয়ানীতিরও পরিপন্থী নয়। বরং ইসলামী সমাজের প্রয়োজনের তাগিদে তা সময়ে সময়ে অপরিহার্য হয়ে যায়। ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন ও দারিদ্র্যের নিপীড়ন থেকে মুক্ত হওয়া ইসলামে অত্যধিক পছন্দনীয়। মূলত অর্থোপার্জনের উপায়-উপকরণ গ্রহণ নিষেধ নয় বরং অন্যায় উপায়ে ও অবৈধ পন্থায় অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা এবং তার অযাচিত ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। এ কারণে ইসলাম দারিদ্র্যের কখনও প্রশংসা করেই না বরং দারিদ্র্যের বিপরীতে হালাল পথে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নে ইসলাম মানুষকে সব সময় উৎসাহ-অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে ধনসম্পদ আর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য-সচ্ছলতা হচ্ছে মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় একটি বড় নেয়ামত ও অনুগ্রহ।

কিন্তু অনৈসলামিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মানব সভ্যতার অধঃপতনের কারণে মানব সমাজে অর্থনৈতিক মতাদর্শ অনেকটা একপেশে, প্রান্তিক ও চরমপন্থার নীতিসংবলিত হয়ে যায়। বর্তমান পৃথিবীর পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই ধন-দৌলত ও অর্থসম্পদে প্রাচুর্য চায় দ্বীনি উদ্দেশ্যে হোক কিংব জাগতিক উদ্দেশ্যে হোক তাকে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় মনে করা হয়, পক্ষান্তরে দারিদ্র্যকে প্রশংসনীয় ও অর্জনীয় মনে করা হয়। পরবর্তী যুগের মুসলমানরা দারিদ্র্যসুলভ জীবনযাপনকে ইসলামের মৌলিক চাহিদা বানিয়ে কিংবা বুঝে নবীয়ে আকরম (সা.)-এর জীবিকা নির্বাহ ও সাহাবায়ে কেরাম ও খাইরুল কুরুনের মুসলমানদের জীবনযাপনকেও একই আঙ্গিকে পরিমাপ করা শুরু করে। ইসলামের সোনালি যুগকেও তারা দারিদ্রতা ও দৈন্যতার উত্থানের যুগ মনে করে নিয়েছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য-সচ্ছলতাকে অপছন্দনীয়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে বর্জনীয় ও ধনসম্পদের প্রাচুর্যতা অর্জনকে অবৈধ ও অনৈসলামিক মনে করে নিয়েছে।

এই মনস্তাত্ত্বিক টান এবং চৈন্তিক আকর্ষণের ফলে কিছু বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে অনেকে এ অকাট্য সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে যে ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমান সবিশেষ রাসূল করীম (সা.) দারিদ্র্যসূলভ নিঃস্ব জীবন যাপন করা ইসলামের মৌলিক চাহিদা মনে করতেন। পক্ষান্তরে ধনাঢ্যতা ও আর্থিক সচ্ছলতা থেকে ইচ্ছাকৃত বিরত থাকতেন। (সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনযাপন আর দারিদ্র্যসুলভ জীবনযাপন এক নয়। কিন্তু প্রায় দেখা যায় আমরা উভয়কে এক করে ফেলি।)

নবী করীম (সা.)-এর জীবনযাপন সম্পর্কে সাধারণত আমরা দুটি মতবাদ লক্ষ করে থাকি। মজার বিষয় হলো, মতবাদদ্বয়ের ফলাফল একই বিন্দুতে এসে একীভূত হয়ে যায়।

তার মধ্যে একটি মতবাদ হলো, মুসতাশরিকীন তথা ওরিয়ন্টিস্ট ও তাদের অনুসারী তথাকথিত নব্য ইতিহাসবিদদের। যারা বলে, রাসূলে করীম (সা.)-এর সম্পর্ক দুর্বল ও হতদরিদ্র শ্রেণীর সাথে ছিল। কারণ তাদের অপরিপক্ব মতামত ছিল, বনু হাশেমের যে শাখার সাথে রাসূলে করীম (সা.)-এর সম্পর্ক ছিল তারা সামাজিকভাবে নিম্নশ্রেণীর ছিল। এ মতামত সৃষ্টিতে তাদের যে দর্শনটি কার্যকরী ভূমিকা রাখে তা হলো, আর্থিক সচ্ছলতা ও ধনসম্পদের প্রাচুর্য যেমন সামাজিক মর্যাদার পরিচায়ক, তেমনি বংশীয় আভিজাত্যেরও পরিচায়ক ও নির্ণায়ক। উদাহরণস্বরূপ খ্যাতিমান লেখক ডিএস মার্গুলেড তাঁর রচিত বই মুহাম্মাদ অ্যান্ড দ্য রাইজ অব ইসলাম পৃ.৪৭-এ লিখেছেন, মুহম্মাদ আভিজাত্যহীন এক সাধারণ বংশে জন্মলাভ করেছেন।

দ্বিতীয় মতামত : আমাদের অধিকাংশ মুসলিম ভাই ও প্রাচ্যের ইতিহাসবিদরা মনে করেন যে নবী করীম (সা.) এর সম্পর্ক পারিবারিক ও সামাজিকভাবে উচ্চবংশের সাথেই ছিল কিন্তু প্রধান কারণ ইয়াতিম হওয়াসহ আরো বিভিন্ন কারণে তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না, দারিদ্র্যাহত ছিলেন। তাঁদের এ দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে যে আকিদা-বিশ্বাসটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে তা হলো, ধনদৌলত ও আর্থিক সচ্ছলতা তাকওয়া ও তহারতের মানদণ্ডে তোলা হবে না বরং তাতে দারিদ্র্যতা ও অসচ্ছলতার ওজন ও মূল্যই তোলা হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিকদের কিতাবে পাওয়া যায়। যেমন– আল্লামা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী দ্য হলি কোরআন ১৬৬৩ পৃষ্ঠার ৬১৮৪ নং টীকায় লেখেন, "The Holy Prophet was poor" হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ফকির ও দরিদ্র্য ছিলেন।

উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয়ের যে ফলাফল বের হয়, তা হলো নবী করীম (সা.)-এর অর্থনৈতিক অবস্থা শুরু থেকেই খুব নাজুক ছিল এবং পরবর্তীতে তা কঠিন দারিদ্র্যের রূপ ধারণ করে। প্রয়োজন ছিল রাসূল (সা.)-এর অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবিকা নির্বাহের সুচারুরূপে গবেষণা করা। কেননা, নববী অর্থনৈতিক জীবনীতেই নিহিত রয়েছে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী জীবনব্যবস্থার মৌলিক নীতিসমূহ।

উপরোক্ত ইলমী জরুরত পূরণ করার সামান্য প্রয়াস এই প্রবন্ধটি।

এ প্রবন্ধে নিম্নোক্ত প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যাবে–

* রাসূল করীম (সা.)-এর সম্পর্ক কি শুধু সমাজের হতদরিদ্র শ্রেণীর সাথে ছিল?

* রাসূল করীম (সা.)-এর অর্থনৈতিক অবস্থা কি শুরু থেকেই কমজুর ও অসচ্ছল ছিল?

* রাসূল করীম (সা.) কি সব সময় অন্যের আশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন?

* হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরেই কি রাসূলে করীম (সা.)-এর আর্থিক অবস্থা ভালো হয়েছে?

* রাসূল (সা.)-এর জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম কি শুধু গনিমতের মাল ছিল?

১. পারিবারিক উত্তরাধিকার :

রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করলে যে প্রশ্নটি সর্বপ্রথম উঠে আসে তা হলো রাসূল করীম (সা.) নিজ পিতা-মাতা ও বংশের অন্য মুরব্বিদের নিকট থেকে উত্তরাধিকার কিংবা উপহারস্বরূপ কী পেয়েছেন?

প্রাচীন ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ নিজ শায়খ আল্লামা ওয়াকেদী থেকে বর্ণনা করেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব একজন বাদী উম্মে আইমন, পাঁচটি বড় উট ও ছাগলের একটি পাল রেখে গিয়েছেন। যা উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হয়েছেন রাসূল সা. (ইবনে সা'আদ, আত-তবকাতুল কোবরা, বৈরুত, ১৯৫৭ ইংরেজি, পৃ. ১০০, নূর মুহাম্মদ গিফারী কর্তৃক রচিত নবী করীম (সা.) কি মা'আশি যিন্দেগী, লাহুর। প্রকাশ-১৯৮৮ ইংরেজি, পৃ. ৬৫, ৬৬)

এ ছাড়া কিছু এমন রেওয়ায়াতও পাওয়া যায়, যা দ্বারা এই ফলাফলে উপনীত হওয়া যায় যে নবী করীম (সা.) নিজ পিতা-মাতার অস্থাবর সম্পত্তিও পেয়েছেন। যেমন ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, বিবাহের পরে জনাব আব্দুল্লাহ সৈয়দা আমেনার জন্য বাড়ি নির্মাণ করেন এবং উভয়ে বৈবাহিক জীবনের শুভসূচনা করেন। (ইবনে ইসহাক, উর্দূ পৃ. ৩৩)

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে যায় যে এ পৈতৃক বাড়ি হুজুর (সা.) উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। আর এ কথার সমর্থনে বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে একাধিক রেওয়ায়াত পাওয়া যায় যে রাসূলে করীম (সা.) ওয়ারিশ সূত্রে পুরাতন ঘরটিও পেয়েছিলেন, যাকে হুজুরের চাচাতো ভাই আকিল ইবনে আবু তালিব হাশেমী কুফরী অবস্থায় বেশি সম্ভব রাসূলের হিজরতের পরপরই আবু সুফিয়ান ইবনে হারব মুসার নিকট বিক্রি করে দিয়ে ছিলেন। (বুখারী শরীফ, বাবু আইনা রাকাযান নবীইয়ূ (সা.) ইয়াওমাল ফাতহী দ্রষ্টব্য, মুসলিম শরীফ কিতাবুল হজ্জ, বাবুন নুযুলে বিমক্কাতা ওয়া তাওরীসি দুওয়ারিহা এবং সুনানে আবী দাউদ কিতাবুল মানাসিক, বাবুত তাহসীব দ্রষ্টব্য)

মুসলিমের রেওয়ায়াতে রয়েছে,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ

উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি মক্কাতে নিজ বাড়িতে অবস্থান করবেন? অতঃপর রাসূল করীম (সা.) বলেন, আকিল কি আমাদের জন্য কোনো গৃহ বা আবাসস্থল অবশিষ্ট রেখেছে? (মুসলিম শরীফ কিতাবুল হজ্জ, বাবুন নুযুলে বিমক্কাতা ওয়া তাওরীসি দুওয়ারিহা, হাদীস নং ৩৩৬০)

এ ছাড়া অন্যান্য তারিখী রেওয়ায়াত ও হাদীসিক বর্ণনা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত নেওয়া কোনোভাবেই অযৌক্তিক হবে না যে, রাসূল করীম (সা.) ওয়ারাশত সূত্রে বাড়ি পেয়েছেন, যাতে হুজুর নিজেই ছিলেন, বেশি সম্ভব হিজরতের আগ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব যখন ব্যবসায়িক সফরে মৃত্যুবরণ করলেন তখন তাঁর ইয়াতিম সন্তান তাঁর নিজস্ব ব্যবসায়িক পণ্য ও মুনাফাই পেয়েছেন শুধু তা-ই নয়, তার সাথে সাথে ব্যবসায়ে অর্জিত নগদ মূল্য ও অন্যান্য সামগ্রীও নিশ্চয় পেয়েছেন। এ

কথার স্বপক্ষে জোর সমর্থন পাওয়া যায় বিভিন্ন রেওয়ায়াতে।

২. নবী করীম (সা.)-এর দুধ পান : হাদীস ও সিরাতের সমস্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মা আমেনাই নবী করীম (সা.)-কে প্রথম কিছুদিন দুধ পান করান। অতঃপর আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে দুধ পান করানোর জন্য হযরত হালিমা সা'দিয়ার হাতে অর্পণ করা হয়। এ বিষয়ে একটি ভ্রান্ত ও অমূলক ধারণার অপসারণ করার প্রয়োজন মনে করছি, যা অনেক সীরাতে গ্রন্থ প্রণেতার লেখনীতে অনুপ্রবেশ করেছে। আর তা হলো, সিরাত নববীর বিভিন্ন লেখকরা বলেন, শিশু মুহাম্মদ (সা.) এতীম হওয়ার কারণে নয় বরং তাঁর দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার কারণে বিবি হালিমা সা'দিয়াসহ অন্যান্য দুগ্ধ পানকারিনী তাঁকে দুধপানের সৌভাগ্যতা অর্জনে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিভিন্ন তারিখী বর্ণনার ওপর চোখ বোলালে ভিন্ন একটি যৌক্তিক কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তা হলো, শিশু মুহাম্মদ (সা.) পিতৃহারা এতীম হওয়াতে তাঁকে নিতে অস্বীকার করা হয়, দরিদ্র হওয়ার কারণে নয়। সীরাতে ইবনে হিশামে রয়েছে, বিবি হালিমা বলেন,

فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبى الصبى فكنا نقول يتيم وماعسى أن تصنع أمه وجده فكنا نكرهه لذلك

শিশু মুহাম্মদকে আমাদের সাথে আসা প্রত্যেক দুগ্ধপানকারিনীর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে কিন্তু যখন শুনলেন তিনি এতীম, প্রত্যেকে অস্বীকার করলেন। কারণ আমরা সদা শিশুর পিতার নিকট সদাচরণের প্রত্যাশী থাকতাম। আমরা বলাবলি করতাম শিশুর মাতা ও দাদা থেকে সদাচরণের আশা করা যায় না। এ কারণে আমরা তাঁকে নিতে অপছন্দ করেছিলাম। (সিরাতে ইবনে হিশাম ১ম খ. ১৬৩ পৃ.। অনুরূপ ইমাম বালাযুরী (রহ.) কর্তৃক রচিত আনসাবুল আশরাফ খ. ১, পৃ. ১৯৩)

ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশাম তাঁদের অনুসারী সীরাত প্রণেতাদের বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে তাঁরা স্বভাবগতভাবে দুগ্ধপোষ্য শিশুর পিতা থেকে ভালো আচরণ ও অতিরিক্ত প্রতিদানের প্রত্যাশী ছিলেন। এ কারণেই রাসূল (সা.)-এর এতীম হওয়াটাই একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল।

৩. স্নেহময়ী মায়ের তত্ত্বাবধানে : বিবি হালিমা সাদীয়ার অঞ্চল থেকে ফিরে আসার পর রাসূল (সা.) আপন মমতাময়ী মায়ের লালন-পালন ও দয়ালু দাদার স্নেহপরশে বড় হতে লাগলেন। সকল প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ, সিরাত ও হাদীস এ কথা বলে যে, ছয় বছর বয়স পর্যন্ত দুই বছর নিজ মাতার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

৪. প্রিয় দাদার তত্ত্বাবধানে : সকল ইতিহাস ও সিরাতপ্রণেতারা একমত যে বিবি আমেনার মৃত্যুর পর নবী করীম (সা.) সরাসরি দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে চলে আসেন এবং দুই বছর দাদার স্নেহ-ছায়া-ঘেরা তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হলেন। ইবনে সা'আদের বর্ণনা মতে, দাদা আব্দুল মুত্তালিব পৌত্র মুহাম্মদকে স্বীয় ছেলেমেয়েদের থেকেও বেশি মোহাব্বত করতেন। সব সময় সাথে সাথে রাখতেন, পাশে বসাতেন, নিরিবিলি ও সম্মিলিত সর্বাবস্থায় কাছে আসার অনুমতি ছিল। এমনকি শোয়ার সময় নবী (সা.) দাদার কাছে চলে যেতেন এবং দাদা প্রিয় পৌত্রকে স্নেহভরে কাছে টেনে নিতেন এবং নিজ বিছানায় বসাতেন। যখন তিনি খানা খেতেন সর্বদা সাথে বসাতেন বরং তিনি না থাকলে খানা খেতেন না।

৫. চাচার তত্ত্বাবধানে : কিছু কিছু বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে মৃত্যুশয্যায় নবী করীম (সা.)-এর দুই আপন চাচাকে রাসূল করীম (সা.)-কে হেফাজত ও তত্ত্বাবধান করার অসিয়ত করে যান দাদা আব্দুল মুত্তালিব। ইবনে সা'আদ বলেন, আবু তালেব নিজ সন্তানের চেয়ে তাঁকে বেশি মোহাব্বত করতেন, নিজের পাশেই শোয়াতেন আর যেখানে যেতেন সাথে নিয়ে যেতেন এবং তাঁর ওপর অত্যধিক স্নেহশীল ছিলেন। বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) ছাড়া আবু তালেবের পরিবার-পরিজন যখন তাঁর সাথে একা খেতেন পরিতৃপ্ত হতেন না আর যখনই হুজুর (সা.) খানাতে শরিক হতেন তখন সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে যেতেন। আবু তালেব সব সময় বলতেন, আমার আদরের সন্তানকে আসতে দাও। অতঃপর খানা খাও।

৬. সর্বপ্রথম নিজ দায়িত্বে, তত্ত্বাবধানে : চাচার ঘরে অবস্থান করে তাঁর তত্ত্বাবধান ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে ধন্য হওয়ার সাথে সাথে চাচাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করলেন এবং চাচার হাতে কিছু তুলে দেওয়ারও চেষ্টা করলেন। কিছু রেওয়ায়াতে রয়েছে যে রাসূল (সা.) ছাগল চড়াতেন। ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম ইবনে মাজা (রহ.)-এর এক রেওয়ায়াতে রয়েছে যে রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন, আমি কারারীতে মক্কাবাসীদের জন্য ছাগল চরাতাম। আর রাসূল (সা.) এই কাজ পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে করতেন। রাসূলে করীম (সা.) এই মেহনত ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক জীবনের শুভসূচনা করেছিলেন।

৭. নবী করীম (সা.)-এর ব্যবসা-বাণিজ্য : নবী করীম (সা.) যৌবনে পদার্পণ করে কোরাইশের অন্য যুবকদের ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। চাচা আবু তালেবের

তত্ত্বাবধানে ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁর হাতেখড়ি। চাচার সঙ্গীরূপে ইয়েমেন ও শামে বাণিজ্য সফরেও আসা-যাওয়া হতে লাগল। ইবনে সা'আদ-এর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে রাসূল (সা.) চাচা আবু তালেব কিংবা অন্য ব্যবসায়িক সাথী-সঙ্গীদের সাথে বাজারে কর্মতৎপর ছিলেন। তাঁদের দ্বারা রাসূল (সা.) তেজারত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাথমিক ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং হযরত খাদিজা (রা.)-এর বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে শাম সফরের পূর্বে পঁচিশ বছর যাবৎ তিনি কমবেশি তেজারত করেছেন এবং সফলভাবেই করেছেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন। এমনকি আরবের আনাচকানাচে তাঁর সততা ও সত্যাবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও কর্মদক্ষতার এমন সুখ্যাতির সুবাস ছড়িয়ে পড়ল যে সে জাহেলি যুগের জাহেলরা পর্যন্ত তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাল আল-আমীন উপাধি দিয়ে।

তৎকালীন আরবদের রীতি ছিল মক্কা মুকার্‌রমার ধনীদের মধ্যে যারা দূরবর্তী সফর ও বাজারের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকত তারা এবং যারা অন্যান্য কারণে নিজে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারত না তারা কর্মতৎপর, কর্মদক্ষ, পরিশ্রমী ও আমানতদার ব্যক্তিকে ব্যবসায়িক পণ্য দিয়ে আরবের বিভিন্ন বাজারে ও কাছের রাষ্ট্র তথা শাম-ইয়েমেন ইত্যাদিতে পাঠাতেন এবং তাদের মধ্যে মুদারাবার আদলে মুনাফার চুক্তি হতো, সে অনুযায়ী লাভের একটা অংশ মুদারিবদের দিতেন। এমনিভাবে উভয় পক্ষই লাভবান হতো। রাসূল (সা.)ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুদারাবার উসূল ও মূলনীতির ওপরই শুভসূচনা করেছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.)-এর বাণিজ্যিক পণ্য শামে নিয়ে যাওয়ার আগে অনেকের সাথে তাঁর ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে যেসব শরিকের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করার কথা পাওয়া যায় তাঁরা হলেন হযরত সায়েব, কায়েস ইবনে সায়েব মাখযূমি ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হাম্মাদ প্রমুখ। তাঁরা রাসূল (সা.)-এর সততা, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা ও কর্মদক্ষতার সাক্ষ্য প্রদান করতেন। এই ব্যবসা-বাণিজ্য নবুয়তপ্রাপ্তির পরও অল্পস্বল্প চালু ছিল তবে ভিন্ন আঙ্গিকে ও ভিন্নভাবে, যা ইবনে কাসীর ও বালাযুরী (রহ.)-এর রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়।

ইবনে কাসীর (রহ.) জাহেলি যুগের প্রসিদ্ধ কবি উমাইয়া ইবনে আবিস সলতের আলোচনা করতে গিয়ে আইমনের সূত্রে বর্ণিত তবরানীর একটি দীর্ঘ মারফূ রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হলো, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব উমভী নিজ বন্ধু উমাইয়া ইবনে আবিস সলতের সাথে তেজারতের জন্য শামে গেলেন। সেখানে দুই মাস অবস্থান করে মক্কায় ফিরে আসেন, অতঃপর ইয়েমেনে বাণিজ্যিক সফরে চলে গেলেন সেখানে পাঁচ মাস অবস্থান করে মক্কা মোকার্‌রমায় প্রত্যাবর্তন করলেন। আবু সুফিয়ান এরপর যখন তাওয়াফে কা'বার জন্য গেলেন তখন রাসূল (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি রাসূল (সা.)-কে বললেন, আপনার ব্যবসায়িক পণ্য অনেক হয়ে গেছে এবং তাতে অনেক মুনাফাও হয়েছে। আপনি কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে তা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন এবং সেই পারিশ্রমিকও নেব না, যা সবার কাছ থেকে সাধারণত নিয়ে থাকি। এ কথা শুনে রাসূল (সা.) অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আপনি পারিশ্রমিক গ্রহণ না করলে আমি ব্যবসায়িক পণ্য নেব না। এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান বলেন, ঠিক আছে আমি আপনার নিকট থেকে তা-ই নেব, যা সবার নিকট থেকে নিই। সুতরাং রাসূল (সা.) নিজের বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে এলেন এবং আবু সুফিয়ানও পারিশ্রমিক নিলেন। এই রেওয়ায়াত ইমাম বাইহাকী (রহ.)ও বর্ণনা করেছেন। আল্লামা বালাযুরী (রহ.) কর্তৃক রচিত আনসাবুল আশরাফের বর্ণনা মতে, এ ঘটনাটি সে সময়ের, যখন রাসূল (সা.) গোপনে দাওয়াতি কার্যক্রম চালাচ্ছিলেন।

নবুয়তপ্রাপ্তির কিছু পূর্বে ও পরের উপরিউক্ত ঘটনাটি রাসূল (সা.)-এর ব্যবসায়িক কর্মতৎপরতার পরিচায়ক, যা মুদারাবার মূলনীতির ওপর ছিল। এ কথা এখন স্পষ্ট, স্বয়ংপ্রকাশ ও দৃঢ়মূল যে রাসূল (সা.) ব্যবসা জগতে সেই মকাম ও মর্যাদা অর্জন করেছেন যে নিজের মাল অন্যদের মুদারাবার ওপর দিচ্ছিলেন। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্যে সফরের প্রয়োজন ছিল না, সাথে সাথে দাওয়াতি কার্যক্রমের কারণে সরাসরি সফরের সুযোগও হয়ে উঠছিল না।

উপরিউল্লিখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা আরো একটি সন্দেহ ও অভিযোগের সমূলে অপনোদন হয়ে যায়, আর তা হলো, কেউ কেউ বলেন, যে রাসূল (সা.) হযরত খাদিজা (রা.)-কে বিবাহ করার পর তাঁর ধনদৌলতের ওপর ভরসা করে জীবিকা নির্বাহের সকল উপায়-উপকরণ জোগান দিয়েছেন।

৮. ব্যবসা-বাণিজ্য ও হযরত খাদিজা (রা.)-এর ধনসম্পদ : নবী করীম (সা.)-এর মক্কি জীবনের অর্থব্যবস্থায় হজরত খাদিজা (রা.)-এর ধনদৌলত বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। হিন্দু লেখক গুরুদত্ত সিং লেখেন, মক্কায় তখন খাদিজা নামি ধনবতী, কুলবতী ও নিষ্ঠাবতী এক বিধবা ছিলেন। রূপ-ঐশ্বর্য তাঁর কম ছিল না, কিন্তু সম্পদ-ঐশ্বর্য ছিল অনেক বেশি আর গুণ-ঐশ্বর্য ছিলও আরো বেশি। মোটকথা, কোনো অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু উপযুক্ত একজন মানুষের, সৎ ও বিশ্বস্ত একজন মানুষের, নির্ভাবনায় যাঁকে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত

করতে পারেন। হযরতের নীতি ও নৈতিকতার সুখ্যাতি তাঁরও কর্ণগোচর হলো। তিনি শুনলেন, হাশেমী যুবক মুহাম্মদ যেমন যোগ্য, তেমনি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ। তিনি সকলের বিশ্বস্ত আল-আমীন। তখনই খাদিজার এই সনির্বন্ধ অনুরোধ উপস্থিত হলো হযরতের খিদমতে 'একজন সৎ ও সত্যবাদী মানুষের বড় প্রয়োজন আমার। আপনার আল-আমীন খ্যাতি আমাকে আকৃষ্ট করেছে আপনার প্রতি। যদি এ বিশ্বাসের মর্যাদা আপনি রক্ষা করতে পারেন এবং আমার ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে সন্তুষ্টচিত্তে আমি দ্বিগুণ লভ্যাংশ দিতে রাজি। এ প্রস্তাব মনঃপূত হলে আমি আপনাকে স্বাগত জানাই।

প্রিয় চাচা আবু তালেবের পরামর্শ নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত খাদিজার প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। খাদিজাও তাঁর সুনির্বাচনের সুফল হাতে হাতে পেলেন। সিরিয়ার বাণিজ্য সফর এমনই সফল ও লাভজনক হলো যে খাদিজা অভিভূত হয়ে পড়লেন। (তোমাকে ভালোবাসি হে নবী) পৃ. ১৭, ১৮।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর প্রস্তাবে রাসূল (সা.)-এর সম্মতিতে মক্কার গণ্যমান্য লোকদের উপস্থিতিতে তাঁদের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিবাহোত্তর হযরত খাদিজা (রা.)-এর অর্থসম্পদ ও ধনদৌলত রাসূল (সা.)-এর অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে–এই সূর্য-সত্যকে কেউ অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাতে পারে না। তার অর্থ এই নয় যে রাসূল (সা.) বিবাহকালীন সময়ে হতদরিদ্র্য ও নিঃসহায়-নিরালম্ব ছিলেন, বিবির অর্থসম্পদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন এবং তাঁর জীবিকা বিবির ধনদৌলতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা আমাদেরকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে যথেষ্ট সহায়তা করে যে, রাসূল (সা.)-এর জীবিকা নির্বাহের নিজস্ব যথেষ্ট উপায়-উপকরণ ও পাথেয় ছিল। কেননা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে যে পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে উল্লেখযোগ্য মাল-সামান ও বাড়ি পেয়েছিলেন, যা সুখ-সচ্ছলতার জন্য যথেষ্ট না হলেও প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। অতঃপর মায়ের লালন-পালন ও দাদা-চাচাদের তত্ত্বাবধানের পরে নিজের কষ্ট-মেহনতের উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে যথেষ্ট আয়-রোজগার ছিল। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁকে সাধারণ স্তর থেকে ধনাঢ্যতার স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীতে হযরত খাদিজা (রা.)-এর মালদৌলত ও ব্যবসা-বাণিজ্য হযরতের ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে মিলে হযরতের জাগতিক জীবনে যথেষ্ট স্বস্তি-প্রশান্তি ও সুখ-সচ্ছলতা এনেছিল। এ ছাড়া অনেক তারিখী রেওয়ায়াতও রাসূল (সা.)-এর নিজস্ব অর্থসম্পদের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, নবী করীম (সা.) প্রত্যেক বছর রমাযান মাসে গারে হেরাতে মোরাকাবা করতেন। এই ধারাবাহিকতা সেই শুরু থেকেই ছিল। মোরাকাবা শেষে তাওয়াফ করতেন এবং সমস্ত মিসকিনকে খানা খাওয়াতেন। (ইবনে হিশাম, খ. ১, পৃ. ২৩৬)

ইবনে ইসহাক এ কথাও বলেন যে রাসূল (সা.)-এর ইবারতে এটাও অন্তর্ভুক্ত ছিল যে কুরাইশের যেসব ফকির-মিসকিনরা তাঁর নিকট আসত তাদের খানা খাওয়াতেন। (ইবনে ইসহাক, উর্দূ পৃ. ১২১)

নবী করীম (সা.)-এর মাঝে মহানুভবতা, দানশীলতা, মেহমানদারি, নিরাশ্রয়দের আশ্রয়দান, দুর্বলদের সাথে সদাচরণ, অপরিচিত ও আজনবীদেরকে অর্থ সহায়তা প্রদানসহ যাবতীয় মানবীয় গুণ তাঁর স্বভাবজাত ও সৃষ্টিগত ছিল। জীবনের প্রতিটি মারহালায় তার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। আর এসব কাজ আঞ্জামদানে অন্যের ধনসম্পদের প্রয়োজন ছিল না। হযরত খাদিজা (রা.) ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় এসব গুণাগুণের কথা বলে বলে রাসূল (সা.)কে সাহস জোগাতেন এবং আপন ঈমানের সাক্ষ্য দিতেন। (সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবুল ওহী; ইবনে ইসহাক পৃ. ১২৩)

রাসূল (সা.) উম্মুল মুমিনীন খাদিজা (রা.)-এর জীবদ্দশায় অন্য কারো সাথে শাদি করেননি। আর এ কাজটি নফস পূজারীদের সকল অপবাদের জবাব হয়ে যায়। কিছু কিছু চোখকানা সমালোচক এ কথা বলতেও দ্বিধান্বিত হলো না যে রাসূল (সা.)-এর অধিক অসহায়ত্ব ও অতিরিক্ত দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হওয়ার কারণে খাদিজা (রা.)-এর জীবদ্দশায় আর কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। অথচ তাদেরই দোসর, ইসলামের কঠিন সমালোচক স্টেনলি লেন পোল পর্যন্ত বলেছেন তাদের এ কথা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ও অন্তঃসারশূন্য।

হযরত খাদিজা (রা.)-কে বিবাহ করলেন, খাওয়াদাওয়ার ইন্তেজাম করা ছাড়াও শ্বশুরবাড়ির অন্য আত্মীয়স্বজনদের জন্য কাপড়চোপড় দিয়েছেন এবং খাদিজা (রা.)-কে বিশটি উষ্ট্রী মোহরস্বরূপ দিয়েছিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, খ. ১, পৃ. ২৪৩)

হিজরতের কিছু আগে হযরত সাওদা (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন এবং প্রত্যেককে গড়ে চার শ থেকে পাঁচ শ দেরহাম মোহর দিয়েছিলেন। (ইবনে হিশাম, খ. ২, পৃ. ৬৪৩) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল করীম (সা.) বিবিদের পাঁচ শ দেরহাম মোহর প্রদান করতেন। (মুসলিম শরীফ, মোহর অধ্যায়)

নবী করীম (সা.)-এর মক্কী গোলামদের মধ্যে ছিলেন যায়েদ ইবনে হারেছা ও উম্মে আইমন (রা.)। হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)-কে হযরত খাদিজা (রা.) থেকে চেয়ে নিয়ে আযাদ করে দিয়েছিলেন এবং হযরত উম্মে আইমন (রা.)-এর সাথে বিবাহ করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদেরই সন্তান হযরত উসামা (রা.) আর এই পুরো পরিবার হুজুর (সা.)-এর তত্ত্বাবধানে ছিল। গোলামদের মধ্যে আরো ছিলেন হযরত আবু কাবাশা, সালেহ শাকরান ও সফীনা। এ ছাড়া মক্কী আরো গোলাম থাকতে পারেন। এই গোলামদেরকে রাসূল (সা.) আযাদ করে দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা হযরতের তত্ত্বাবধানে রয়ে গিয়েছিলেন। তদ্রূপ হিজরতের পূর্বে রাসূল করীম (সা.)কে সমস্ত সামানপত্র ও জন্তু-জানোয়ার ত্যাগ করতে হয়েছিল। তবে হযরত আবু বকর (রা.) যে কোসওয়া নাম্নি উষ্ট্রী জোগাড় করেছিলেন তা চার শত দেরহাম দিয়ে ক্রয় করে নিয়েছিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, খ. ১, পৃ. ৪৭৮, ইবনে সা'আদ, খ. ১, পৃ. ৪৯২)

ইবনে ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে রাসূল (সা.) ইসলামের বাণী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে দুটি খানার দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছিলেন যেখানে আব্দুল মোত্তালিব গোত্রের প্রায় চল্লিশজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা পেট ভরে খেয়েছিলেন। এই দুই দাওয়াতে নিশ্চয়ই অনেক ব্যয় হয়েছে।

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم -عَلَى الصَّفَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন এই আয়াত নাযিল হয় যার অর্থ 'তোমার নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনদের সাবধান করো' তখন রাসূল করীম (সা.) সাফা পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ! হে ছফিয়্যা বিনতে আব্দিল মোত্তালিব! হে আব্দুল মোত্তালিবের সন্তানেরা! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ধরা থেকে বাঁচাতে পারব না। তবে আমার মালদৌলত থেকে যা চাও, চেয়ে নিতে পারো। (মুসলিম শরীফ, খ. ২, পৃ. ১২৬)

উপরোক্ত হাদীসে রাসূল (সা.) নিজের মালদৌলতের কথা সরাসরি উল্লেখ করেছেন।

উপরোক্ত সকল বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে রাসূল (সা.) ছিলেন আর্থিকভাবে সচ্ছল।

৯. মক্কিজীবনে সাহাবায়ে কেরামের হাদিয়া-তোহফা : মদনী যিন্দেগীর মতো মক্কি যিন্দেগীতেও যে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-এর দরবারে হাদিয়া-তোহফা পেশ করতেন তার ব্যাপারে অনেক রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। নবী করীম (সা.)-এর সবচেয়ে নিকটতম সাহাবী ছিলেন রাসূলের প্রাণপ্রিয় বন্ধু, প্রাণোৎসর্গকারী সঙ্গী হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। এ সেই সাহাবী, যিনি রাসূলে করীম (সা.)-কে প্রতি পদে পদে জানমাল দ্বারা সাহায্য করে গিয়েছেন। প্রতি কদমে কদমে নবীপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। খোদ নবী করীম (সা.) বলেছিলেন, আবু বকরের মাল ও খিদমত থেকে আমার যত বেশি উপকার হয়েছে আর কারো মাল থেকে তত উপকার হয়নি। এই সেই সাহাবী, যিনি নবী করীম (সা.)-এর মদীনা হিজরতের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা তথা সফরের পাথেয়, সওয়ারী, খাদেম, পথপ্রদর্শকসহ সব কিছুর আঞ্জাম দিয়ে চির ধন্য হয়েছেন।

এই হিজরতের সময় মক্কী মুসলমানদের মধ্যে হযরত তালহা ও যোবায়ের (রা.) নবী করীম (সা.)-কে কাপড় হাদিয়া দিয়েছিলেন।

ইসলামের সূচনালগ্নে গোপনে দাওয়াতি কার্যক্রম চলাকালে হযরত রাকেম ইবনে আবী আরকাম মাখযূমী (রা.) নিজ গৃহকে দাওয়াতি মারকায হিসেবে পেশ করলেন এবং সেখানে অবস্থানকালে রাসূল (সা.)-এর অন্যান্য খিদমাত এই আত্মত্যাগী সাহাবা আঞ্জাম দিতেন।

বনু হাশেম ও মুসলমানদেরকে বয়কটের কঠিন সময়ে হযরত হাকীম ইবনে হিযামসহ অন্য দরদি ব্যক্তিরা রসদ-সরঞ্জাম প্রেরণ করতেন তা তো বিভিন্ন তারিখী বর্ণনায় পাওয়া যায়।

মক্কি জীবনীতে নবী করীম (সা.)-এর জীবিকা নির্বাহসংক্রান্ত উপরিউক্ত অসম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে যে রূপরেখা আমাদের সামনে ফুটে ওঠে তা হলো, রাসূলে আকরাম (সা.) শুরুর জীবনে দারিদ্র্যতা ও নিঃস্বতার শিকার ছিলেন না। জন্মগত এতীম ছিলেন তা ঠিক কিন্তু পিতার রেখে যাওয়া সহায়-সম্পত্তি তাঁর শিশুজীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে বড় ভূমিকা পালন করে, তথাপি মায়ের মমতা ও ধনসম্পদেরও আশ্রয় ছিল। মাতৃহারা হওয়ার পরে দাদা আব্দুল মোত্তালিব আপন পিতৃমাতৃহারা এতীমকে জীবনযাত্রায় কোনো ধরনের সংকীর্ণতা ও বঞ্চনার অনুভব হতে দেননি। দাদার মৃত্যুর পর এতীম ভাতিজার পূর্ণ জিম্মাদারি তাঁর দুই চাচা আবু তালেব ও যোবায়ের বিন আব্দুল মোত্তালিব নিজ কাঁধে নিয়ে নেন। এই সেই আবু তালেব, যিনি ছিলেন রাসূল (সা.)-এর দুঃখ-কষ্টের ও বিপদ-দুর্যোগের আমৃত্যু সঙ্গী। যিনি জীবন ও ইজ্জতের ঝুঁকি নিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর প্রাণপ্রিয় ভাতিজাকে প্রাণপণ সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

প্রায় শৈশবকাল থেকেই রাসূল (সা.)-এর নিজ পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা ছিল, তাই তো নবীদের চিরাচরিত পেশা মেষপাল চড়ানোর মতো পেশা গ্রহণ করলেন, যা থেকে বহু অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে। শৈশব-কৈশোরের গণ্ডি পেরিয়ে যখন যৌবনকালে পদার্পণ করলেন তখন বংশীয় পেশা গ্রহণ করলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগী হলেন, দেখতে দেখতে যখন তিনি পূর্ণ যুবক হয়ে উঠলেন তখন তিনি রীতিমতো
পূর্ণাঙ্গ তাজেরও বনে গেলেন। যখন তিনি পঁচিশ বছর বয়সে ধনবতী বিধবা খাদিজা (রা.)-কে বিয়ে করলেন তখন তিনি পূর্ণ সফল ও সুখ-সচ্ছল এক তাজের ছিলেন। অতঃপর তিনি নিজ তেজারতের সাথে নিজ বিবির তেজারতকে একীভূত করে ফেললেন তখন তিনি 'গেনা' তথা ধনাঢ্যতার সেই স্তরে পৌঁছে গেলেন, যার কথা কোরআন শরীফে আলোচনা হয়েছে।

নববী জীবনযাত্রা মাদানী যুগে :

সাধারণত নববী জীবনযাত্রার উপায়-উপকরণ দুই পদ্ধতিতে বিভক্ত ছিল। যথা–ব্যক্তিগত চেষ্টা ও উপার্জন, যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ছিল বেশি, দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল সামষ্টিক তথা সামাজিক চেষ্টার ওপর ভিত্তি করে। তাতে গনিমত ও মালে ফাই ছিল সর্বোত্তম মাধ্যম, অতঃপর হাদিয়া-তোহফা। মক্কি যুগে নববী জীবিকা নির্বাহ প্রথম পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। মদীনা মুনাওয়ারাতে যেহেতু রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ও অন্যান্য দাওয়াতি ও জিহাদী কর্মকাণ্ডের ব্যস্ততা ছিল কল্পনাতীত, তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সময় বের করা অসম্ভব ছিল। এ কারণেই মাদানী যুগের প্রাথমিক সময়ের জীবিকার উপায়-উপকরণের বেশির ভাগ জিম্মাদারী মদীনাবাসী ও সাহাবায়ে কেরাম পালন করেছেন। প্রত্যেক সাহাবীর মনের চির আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজ ধনদৌলত প্রাণপ্রিয় রাসূলের বরকতময় ব্যবহারে আসুক। তাই রাসূল (সা.)-এর এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। প্রথমে সাহাবায়ে কেরামের হাদিয়া-তোহফা ও বিভিন্ন খিদমত নিয়ে আলোচনা করা যাক।

মাদানী যুগে সাহাবায়ে কেরামে হাদিয়া-তোহফাসমূহ :

যেহেতু মানুষের জৈবনিক চাহিদাসমূহের মধ্যে প্রধানতম চাহিদা হলো শরীর ও প্রাণের মধ্যে সেতুবন্ধনের মাধ্যম খাদ্য, তাই প্রথমেই তার আলোচনা করা হবে।
রাসূল (সা.)-এর খাদ্যের ব্যবস্থার মাধ্যম কী ছিল?
হিজরতের পর রাসূল (সা.) কোবাতে কিছুদিন অবস্থান করেন। বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সেখানে ১৪ দিন অবস্থান করেছিলেন এবং আমর ইবনে আউফ গোত্রের বর্ষীয়ান সরদার হযরত কুলসুম ইবনে হিদমের ভাগ্যেই হযরতের আতিথেয়তার সৌভাগ্য হয়। সে সময় নবী করীম (সা.)-এর সমস্ত প্রয়োজন সেই সৌভাগ্যবান সরদারই করেছিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, খ. ১ পৃ. ৪৯৩, বুখারী শরীফ)
নবী করীম (সা.) যখন মদীনা মুনাওয়ারার মূল শহরে পৌঁছলেন এবং উটনী যখন আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর ঘরের নিকট গিয়ে বসে পড়ল তখন রাসূল (সা.) তাঁর গৃহে অবস্থান করলেন। নবী করীম (সা.)-এর উটনীকে হযরত সা'আদ ইবনে যরারাহ (রা.) নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং তার শস্যদানার ইনতেযাম করলেন। আর রাসূল (সা.)-এর খানাপিনার ব্যবস্থা করতেন হুজুরের মেজবান আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ততক্ষণ পর্যন্ত লোকমা গ্রহণ করতেন না, যতক্ষণ না রাসূল (সা.) খেয়ে নেন। তাঁরা সেই প্লেটে সেই জায়গা থেকে খানা শুরু করতেন, যে জায়গায় রাসূলের আঙুল মোবারকের ছাপ রয়েছে। অন্য সাহাবায়ে কেরাম রীতিমতো হযরতের জন্য খানা পাঠাতেন। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর নিয়ম ছিল যে রাসূল (সা.) ওপরের তলায় অবস্থান করতেন আর নিচতলা থেকে খানার সময়ে দস্তরখান পাঠিয়ে দিতেন আর রাসূল (সা.) সেখান থেকে চাহিদা অনুযায়ী খেয়ে বাকি খানা ফেরত পাঠাতেন, যা থেকে মেজবানরা হযরতের জুটা খেয়ে ধন্য হতেন। সাহাবায়ে কেরাম সাধারণত বিকালের দস্তরখানে মেজবানসহ উপস্থিত থাকতেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, খ. ১, পৃ. ৪৯৭-৯৯; বালাযুরী রচিত আনসাবুল আশরাফ, খ. ১ পৃ. ২৬৭)
হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর মেহমানখানায় রাসূল (সা.) প্রায় সাত মাস ছিলেন। ইবনে সা'আদের বর্ণনা অনুযায়ী সেই সাত মাসে এমন কোনো দিন ছিল না, যেদিন তিন-চারজন সাহাবীর ঘর থেকে রাসূল (সা.)-এর জন্য খানা আসেনি। আল্লাম বালাযুরী (রহ.) বলেন, সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে বনু নাজ্জারের সাহাবারা বারবার খানা পাঠাতেন (আনসাবুল আশরাফ, খ. ১ পৃ. ২৬৭)

মদীনাবাসীর পক্ষ হতে হাদিয়া ও মেজবানী :

সাত মাস পর হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর মেজবানী শেষ হয়ে গেল। রাসূল (সা.) প্রথমে মসজিদে নববী নির্মাণ করলেন। অতঃপর দুই বিবি হযরত আয়েশা ও হযরত সাওদাহ (রা.)-এর জন্য হুজরা নির্মাণ করলেন। মসজিদের জমিন স্বয়ং রাসূল (সা.) এক আনসারী সাহাবা থেকে ক্রয় করেছিলেন এবং তার নগদমূল্য ছিল দশ দিনার এক শত বিশ দেরহাম। আর হযরত আবু বকর (রা.) নিজের পকেট থেকে তা

পরিশোধ করে দেন। মসজিদের নির্মাণসামগ্রী মদীনার দানশীল সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জোগাড় করেছিলেন। নির্মাণকাজে রাসূল (সা.) সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর মসজিদের পাশেই দুটি হুজরা নির্মাণ করা হয়েছে। (সীরাতে ইবনে হিশাম, খ. ১, পৃ. ৪৯৭-৯৯; বুখারী শরীফ, বাবু হিজরতুন নবী, শিবলী নোমানী, খ. ১ পৃ. ২৮০-২৮৩) রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট না হলেও সাধারণ সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে হুজরাদ্বয়ের জমিন ও প্রয়োজনীয় নির্মাণসামগ্রী সাহাবায়ে কেরামের হাদিয়া ছিল।

বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে রাসূল করীম (সা.) যখন যখন বিয়ে করতেন তখনই পবিত্র স্ত্রীদের জন্য ঘর নির্মাণ করা হত। আর এ ঘরগুলো মসজিদের পাশে সারিবদ্ধভাবে ছিল এবং প্রত্যেক ঘরের প্রস্থ ছিল ছয় থেকে সাত হাত ও দৈর্ঘ্য ছিল দশ হাত। এ ঘরের জমিন ও নির্মাণসমগ্রীসমূহ জোগান হতো সাহাবায়ে কেরাম সবিশেষ আনসারী সাহাবায়ে কেরামের হাদিয়া থেকে। (শিবলী নোমানী, খ. ১ পৃ. ২৮০-২৮৩)

যখন হুজুর (সা.) স্ত্রী-সন্তানসহ ঘরে অবস্থান করা শুরু করলেন তখনও সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষ করে আনাসারী সাহাবায়ে কেরামের হাদিয়া-তোহফার ধারাবাহিকতা চালু ছিল। হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ আমৃত্যু খানার এক বড় পেয়ালা পাঠাতেন। একই কাজ করতেন হযরত সা'আদ ইবনে ওবাদা (রা.)। (আনসাবুল আশরাফ, খ. ১ পৃ. ২৬৭; আত-তবকাতুল কোবরা, খ. ৩, পৃ. ৬১৪)

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হুজুর (সা.)ও উম্মুহাতু মুমিনীনের জন্য হাদিয়াস্বরূপ খাদ্যদ্রব্য পাঠাতেন এ রকম হাজারো রেওয়ায়াত পাওয়া যাবে হাদীস-আসার ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে।

সাহাবায়ে কেরামের দাওয়াত :

আরেকটি সুন্নাতে নববী হলো, নবী করীম (সা.) সময়ে সময়ে বিভিন্ন সাহাবীর ঘরে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যেতেন। যখন যাঁর ঘরে যেতেন তিনি যথাসম্ভব রাসূল (সা.)-এর আদর-আপ্যায়ন করতেন। বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে রাসূল (সা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে যিয়ারতের সময় সাহাবাগণ খানার দাওয়াত দিতেন। এ রকম এক যিয়ারতে রাসূল (সা.)-এর সামনে রানের গোশত পেশ করা হলে রাসূল (সা.) আগ্রহভরে খেয়েছিলেন। হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে এরূপ দাওয়াতের আলোচনা ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। এরূপ দাওয়াত ও যিয়ারত ছাড়াও রাসূল (সা.) বিভিন্ন বিয়েশাদি ও খানার আয়োজনেও যেতেন যদি শরয়ী কোনো বাধা না থাকত। যেমন রবী' বিনতে মুআওয়াজ ইবনে 'আফরা ও আবু উসাইদ ইবনে সায়েদীর শাদির দাওয়াত বেশ প্রসিদ্ধ। (সহীহ বুখারী শরীফ, কিতাবু আশরিবা, মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবু 'ইলানিন নিকাহ)

বালাযুরী (রহ.)-এর এক বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আবু আইয়ূব আনসারীসহ অন্য সাহাবায়ে কেরাম হুজুর (সা.) ও তাঁর পরিবারের জন্য পানিভর্তি মটকার ব্যবস্থা করতেন। (আনসাবুল আশরাফ, খ. ১ পৃ. ৫৩৫)

রাসূল (সা.)-এর নিজস্ব আয়-রোজগারের ব্যবস্থা :

উপরোল্লিখিত আলোচনা ছিল মূলত সাহাবায়ে কেরামের হাদিয়া-তোহফা, দাওয়াত, ইজতেমায়ী খানার। এখন প্রশ্ন হতে পারে রাসূল (সা.) নিজের জন্য ও পরিবারের জন্য স্থায়ী কী ব্যবস্থা ছিল? তাঁদের সকলের জীবিকা নির্বাহ কি হাদিয়ার ওপর ছিল? খাদ্যের জন্য স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা ছিল কি? এরূপ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসে সহজে পাওয়া যায়। সেসব বর্ণনাসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে রাসূল (সা.) অন্যের দেওয়া হাদিয়া-তোহফার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজস্ব আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিম্নে তারই আলোচনা করা হবে।

জন্তু প্রতিপালন করা : দুধওয়ালা জন্তু লালন-পালন জীবিকা নির্বাহের প্রধান একটা মাধ্যম। হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের ও রাসূল (সা.)-এর বেশির ভাগ খাদ্য ছিল দুধ। (সীরাতুন নবী, খ. ১, পৃ. ৪৭১)

হাদীস, সীরাত ও তারীখের বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায় যে, রাসূল (সা.) মদনী যুগের সূচনালগ্ন থেকেই দুধওয়ালা জানোয়ার, বিশেষ করে উন্নতমানের উটনী নিয়মিতভাবে লালন-পালন করেছেন। তাঁর দেখাশোনার জন্য পুরোদস্তর রাখালও ছিল এবং নির্দিষ্ট চারণভূমিও ছিল। বালাযুরীর এক বর্ণনায় রয়েছে যে রাসূল (সা.) প্রত্যেক স্ত্রীকে একটি করে উটনী দিয়েছেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর উটনীর নাম ছিল আল-আরীস, হযরত আয়েশা (রা.)-এর উটনীর নাম ছিল আস-সামরা। উম্মে সালমা বলতেন, সেই উটনী থেকে আমাদের জন্য পরিমাণমতো দুধও পাওয়া যেত। এ রকম উটনীর সংখ্যা ছিল দশটি।

হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে হুজুর (সা.)-এর সাতটি উটনী ছিল, যা চরাতেন উম্মে আইমন (রা.)। বালাযুরী (রহ.)-এর অন্য একটি রেওয়ায়াত থেকে বোঝা যায় যে উটনীর সাথে সাথে ভেড়ার একটা পালও ছিলা।

স্ত্রীগণের মালদৌলত : নবী করীম (সা.)-এর আয়-ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে একটি খাত হলো উম্মুহাতুল

মুমিনীনের ধনসম্পদ। নবী করীম (সা.)-এর প্রায় স্ত্রীই ছিলেন সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের সদস্য। বিভিন্ন সময় তাঁদের ভাই-বোন ও পিতা-মাতাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকারের হাদিয়া-তোহফা আসত, যাতে নগদ মূল্যের অর্থসম্পত্তিও থাকত। কিছু কিছু স্ত্রীর সাবেক স্বামী থেকে ওয়ারাছাতস্বরূপ সম্পত্তি পেয়েছিলেন, যেখানে এমন জায়গা-জমিনও থাকত, যার স্বতন্ত্র মুনাফা হতো কিংবা ফসল উৎপন্ন হতো। উদহারণস্বরূপ হযরত উম্মে সালামা (রা.) পারিবারিক জায়গা-জমিনের যে অংশ পেয়েছিলেন তাতে তায়েফের বাগানও ছিল। মদীনা মুনাওয়ারাতে অবস্থানকালীন সে বাগানের উৎপন্ন ফসল তাঁর জন্য পাঠানো হতো। আর তাতে সবচেয়ে প্রিয় ছিল মধু, যা রাসূলের নিকট সব থেকে প্রিয় ছিল। (আনসাবুল আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৪২)

এরূপ হযরত খাদিজার মালদৌলতের কথা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) নাজ্জাশী বাদশাহর পক্ষ হতে হুজুর (সা.)-এর জন্য মূল্যবান হাদিয়া-তোহফা এনেছিলেন এবং মোহরের দেরহামও উসূল করেছিলেন। (ইবনে হিশাম, খ. ২, পৃ. ৩৬২)

তদ্রূপ হযরত মারিয়া কিবতিয়া মিসরের বাদশা থেকে বহু হাদিয়া-তোহফা এনেছিলেন। (সীরাতুন নবী, খ. ১, পৃ. ৪৭১)

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এসব জিনিসপত্র তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও রাসূল (সা.)-এর সামাজিক জীবনে এসবের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মালে গনিমত (যুদ্ধলব্ধ মাল) : যেসব মালদৌলত মুজাহিদীন আল্লাহ রাস্তায় কাফেরদের সাথে জিহাদ করে অর্জন করেন তাকেই মালে গনিমত বলে।

নববী জীবনযাত্রা : মালে গনিমত

নববী জীবনযাত্রার পাথেয় ও উপায়-উপকরণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম উপকরণ হলো ইসলামী জিহাদের ফলে অর্জিত মালে গনিমত। তা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা–আমওয়াল মানকুলা তথা স্থাবর সম্পত্তি, দ্বিতীয়ত গাইরে মানকুলা তথা অস্থাবর সম্পত্তি, জায়গা-জমিন। উভয়ের অর্জনের কারণে শুধু নবী করীম (সা.)-এর জীবনযাত্রার উন্নত হয়নি বরং তার সাথে সাথে মদীনাবাসী ও অন্য মুজাহিদদের জীবিকারও উন্নতি সাধিত হয়েছে।

গনিমতের মালে সাধারণত প্রত্যেক প্রকারের মালদৌলত থাকে। এই গনিমতের মালকে বণ্টননীতি অনুযায়ী রাসূল (সা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণপূর্বক এক মুজাহিদের অংশসমান পাবেন এবং বিশেষ অংশ পেতেন। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে সমস্ত মালে গনিমতের খুমুস তথা এক-পঞ্চমাংশ পেতেন যাকে রাসূল (সা.) তিন ভাগে বিভক্ত করতেন। একাংশ পরিবার-পরিজনের জন্য নির্ধারিত, একাংশ রাসূল (সা.)-এর খান্দান বনু আব্দুল মোত্তালিব ও বনু হাশেমের জন্য ও তৃতীয় একাংশ সাধারণ দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণের জন্য।

নাখলা যুদ্ধ (রজব-২হি./জানুয়ারি-৬২৪ ইং) : এই যুদ্ধে গনিমত হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল যথাক্রমে কয়েক মশক শরাব, শুকনা খেজুর, চামড়া ও কোরাইশের ব্যবসায়িক পণ্য। (ইবনে হিশাম, খ. ২, পৃ. ২৪০, ওয়াকেদী, পৃ. ১৫-১৬, ইবনে সা'আদ,খ. ২, পৃ. ১১; তবরী, খ. ২, পৃ. ৪১১)

বদর যুদ্ধ (১৭ই রমাযান ২য় হি./২৪ মার্চ ৬২৪ ইং) : ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে গনিমত হিসেবে বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধ সরঞ্জামসহ এক শত পঞ্চাশটি উট ও দশটি ঘোড়া, সাথে কিছু সামান, কিছু কাপড়, চাটাই ও ব্যবসায়িক চামড়া পাওয়া গিয়েছিল। বদর যুদ্ধের বন্দিদের মুক্তিপণ থেকে বড় অংকের মুদ্রা অর্জন হয়েছিল। (ইবনে হিশাম, খ. ২, পৃ. ৪০৪-৪০৮, ওয়াকেদী, পৃ. ১১৫-১১৬, ইবনে সা'আদ, খ. ২, পৃ. ১৭-১৮)

বদর যুদ্ধে বিশেষ অংশ হিসেবে রাসূল (সা.) নিজের জন্য নিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ তালোয়ার যুল ফাকার, মুজাহিদের অংশ হিসেবে আবু জাহেলের জমল নামিদামি উটটি। আর গাযওয়ায়ে বনু কাইনুকাতে হুজুর (সা.) বিশেষ অংশ হিসেবে পেয়েছিলেন তিনটি কামান, তিনটি তলোয়ার ইত্যাদি। আর বনু কাইনুকাতে যে অস্থাবর সম্পত্তি গনিমত হিসেবে অর্জিত হয়েছিল তা মুসলমানদের প্রয়োজন ও রাসূল (সা.)-এর প্রয়োজনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। রাসূল যাকে চেয়েছেন দিয়েছেন। (আনসাবুল আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৩০৯)

হিজরী তৃতীয় বর্ষে সকল যুদ্ধের মধ্যে মোট তিন যুদ্ধে গনিমতের মালা পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে এক যুদ্ধে পাঁচ শত উট হস্তগত হয়। (আনসাব, খ. ১, পৃ. ৩১০)

এরূপ কমবেশ সকল যুদ্ধে গনিমতের মাল পাওয়া গিয়েছিল, যা থেকে রাসূল (সা.)-এর বিশেষ অংশ, ও এক মুজাহিদের অংশসহ খুমুস পেয়েছিলেন। এসব গনিমতের মাল থেকে যা কিছু পাওয়া যেত তা নগদ মুদ্রা হোক কিংবা অন্য রসদসামগ্রী। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র হোক, কিংবা জমিজমা, রাসূল (সা.) নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না বরং অন্যদেরকে দিয়ে দিতেন, যা রাসূল (সা.)-এর বদবখত সমালোচকরাও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে।

রাসূল (সা.)-এর কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থামাধ্যম : খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থার যেমনি বিভিন্ন মাধ্যমে হতো তেমনি অন্যান্য জরুরি চাহিদা পূরণও বিভিন্ন মাধ্যমে হতো। রাসূল (সা.)-এর লেবাস মোবারকের ব্যবস্থার দুটি প্রধান মাধ্যম

হলো মুসলিম ও অমুসলিমের দেওয়া হাদিয়া-তোহফা।

সাহাবায়ে কেরামের হাদিয়া :

সাহাবায়ে কেরামের হাদিয়ার মধ্যে হযরত দিহ্য়াতুল কালবী (রা.)-এর হাদিয়া ছিল এক বর্ণনা অনুযায়ী দুটি মোজা, আরেক বর্ণনা অনুযায়ী একটি জুব্বা। রাসূল (সা.) এগুলোকে এত বেশি পরিধান করেছেন যে তা পুরাতন হয়ে গিয়েছিল। (তিরমিযী, বাবু লুবসিল জুব্বাহ)

তদ্রূপ হাবশার বাদশাহ রাসূল (সা.)-এর জন্য কালো কালো মোজা পাঠিয়েছিলেন অন্যান্য হাদিয়া-তোহফার সাথে। (তিরমিযী, বাবুন ফীল খুফফিল আসওয়াদ)

মুহাদ্দিসীনের বর্ণনা অনুযায়ী আবু জাহাম ইবেন হোযায়ফা (রা.) রাসূল (সা.)-কে একটি নকশাওয়ালা শামী জুব্বা হাদিয়া দিয়েছিলেন। নামাযে ওই নকশার দিকে মন যাওয়ায় তা ফেরত দিয়ে একটি মোটা কাপড়ের পরিধানবস্ত্র নিয়েছিলেন। (বুখারী শরীফ, বাবুন ইযা ছল্লা ফী ছাওবিন লাহু আলামুনল)

হযরত সোহাইল (সা.) থেকে বর্ণিত যে একজন মহিলা রাসূল (সা.)-কে একটি চাদর হাদিয়া দিয়েছিলেন সে মহিলা এ কথাও বলেছিল যে আমি নিজ হাতে আপনার জন্য বুনেছি। রাসূল তা সাদরে গ্রহণ করলেন এবং ইযার হিসেবে ব্যবহার করতেন। (বুখারী শরীফ)

এ ছাড়া আরো বহু কাপড় হাদিয়ার কথা বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। (ইবনে সা'আদ, খ. ৩ পৃ. ২১৫ দ্রষ্টব্য)

অমুসলিমদের হাদিয়া : অমুসলিমদের হাদিয়া-তোহফার কথাও পাওয়া যায়।

যেমন–দাওমাতুল জান্দলের বাদশাহ রাসূলের জন্য রেশমের জুববা পাঠিয়েছিলেন। তদ্রূপ বহু বাদশাহ রাসূল (সা.)-এর জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ হাদিয়া পাঠিয়েছেন। যেমন যু-ইয়াযন নামের এক বাদশা রাসূল (সা.)-এর জন্য এমন এক লাল কাপড়জোড়া পাঠিয়েছেন, যা তিনি ৩৩টি উটনীর বদলায় ক্রয় করেছিলেন। আর রাসূল (সা.)-এরও চিরাচরিত নিয়ম ছিল যাঁরা হাদিয়া দিতেন তাঁদেরকেও তিনি হাদিয়া দিতেন। এ সুন্নাত অনুযায়ী রাসূল (সা.)-ও সেই শাহ যুইয়াযনের জন্য এমন একটি কাপড়জোড়া হাদিয়াস্বরূপ দিয়েছেন, যা পঁচিশটি বড় উটনীর বদলে ক্রয় করেছেন। (আবু দাউদ, বাবু লুবসিস সওফ ওয়াশ শা'র)

বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা নবী করীম (সা.)-এর পোশাক-পরিচ্ছেদ সম্পর্কে বাস্তব যে রূপটি ফুটে ওঠে তা হলো শুরুর দিকে পোশাক-পরিচ্ছেদের সংকট প্রকট ছিল। বেশির ভাগ দুই কাপড় পরিধান করতেন অর্থাৎ শরীরের ওপরের অংশের জন্য চাদর কিংব জুব্বা কিংব কোর্তা ইত্যাদি আর নিচের অংশের জন্য সাধারণত ইযার পরিধান করতেন। দ্বিতীয়ত যা জানা যায়, তা হলো মোটা কাপড় পরতেন, মাঝেমধ্যে দামি-উন্নত পোশাকও পরিধান করেছেন। সবই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত। শুরুর যমানায় ছিল সংকীর্ণতা ও সংকট। পরের যমানায় ছিল সচ্ছলতা ও ফরাগত।

আরোহনের জন্তু ও তার জোগান :

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্য-বস্ত্র ছাড়া আরো যেসব জরুরি চাহিদা রয়েছে সেসব চাহিদা পূরণেরও প্রধানতম উপায় হচেছ আগের মাধ্যমদ্বয়সহ মালে গনিমত ও নিজস্ব চেষ্টা। সওয়ারী জন্তুর চাহিদাও ছিল সে যুগে অনেক বেশি। আর এ চাহিদা পূরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে মুসলিমদের হাদিয়া, অমুসলিমদের নযরানা ও গনিমত। এ বিষয়ে কিছু রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। যেমন–ইবনে সা'আদ থেকে বর্ণিত যে ফরওয়া ইবনে নাফাসা জুযামী রাসূল (সা.)-কে একটি সফেদ খচ্চর হাদিয়া দিয়েছিলেন, যার ওপর সওয়ার হয়ে হুনাইন যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

বালাযুরী বলেন যে ফরওয়া তাঁকে একটি ইয়া'ফুর নামি ও আরেকটি ফিজ্জা নামি খচচর হাদিয়া দিয়েছিলেন এবং আনতারাব নামক ঘোড়াও দিয়েছিলেন। তদ্রূপ বর্ণনায় আছে মুকাওকিস লাযার নামক ঘোড়া, রবীআ ইবনে আসসাবরা কিলাবী 'লুহাইফ' ও হযরত তামীমে দারী (রা.) 'আল ওইরদ' নামক ঘোড়া রাসূল (সা.)-এর খিদমতে পেশ করেছিলেন। (সওয়ারী জন্তুর হাদিয়াসংক্রান্ত আলোচনা ইবনে সা'আদ, খ. ৪, পৃ. ১১৮ ও ১৫০-১৫২; আনসাবুল আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৫০৫৮-৫১১ দ্রষ্টব্য)

তদ্রূপ গনিমত হিসেবে অনেক সওয়ারী জন্তুর জোগাড় হয়েছিল, যা পূর্বে আলোচনা হয়েছে। অনুরূপ ব্যক্তিগত উদ্যোগেও কিছু সওয়ারী জন্তু ক্রয় করেছিলেন। যেমন–কুহুওয়া নামক উটনীর কথা আগেই আলোচনা হয়েছে যে রাসূল (সা.)-কে মদীনা হিজরত করার সময় হযরত আবু বকর (রা.) হাদিয়া দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু রাসূল (সা.) তা বাকিতে ক্রয় করে নিয়েছেন, যা মদীনায় এসে আদায় করেছেন। আরো রেওয়ায়াতে আছে, হুজুর (সা.)-হযরত আবু বকর (রা.) থেকে দুটি উট ক্রয় করে নিয়েছিলেন, যা তিনি মক্কা মুকাররমা থেকে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে আসার জন্য যায়েদ ইবনে হারেছা ও আবু রাফেকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। অনুরূপ হযরত জাবের থেকেও চল্লিশ দেরহাম দিয়ে একটি উট ক্রয় করেছিলেন, যা আবার তাঁকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

আল্লামা বালাযুরী (রহ.) বর্ণনা করেন যে রাসূল (সা.) বনু ফাযারার এক বেদুঈন থেকে দশ উকিয়া তথা চার শ দেরহাম

দিয়ে আলফারস নামক একটি ঘোড়া ক্রয় করেছিলেন আর সেটিই যুদ্ধের প্রথম ঘোড়া ছিল (আনসাবুল আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৫০৯)

নবী করীম (সা.)-এর মালিকানা জায়গাজমি : আগেই আলোচনা হয়েছে যে রাসূল (সা.) যখন মদীনায় হিজরত করে তাশরীফ আনেন, তখন আনসারী সাহাবাগণ তাঁদের দখলে থাকা অনাবাদি জায়গাজমি রাসূল (সা.)-এর হাতে সোপর্দ করে দেন। আর রাসূল (সা.) সেগুলোকে নিজ স্ত্রী ও বেটিদেরসহ সমস্ত মুহাজের সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন, যার ওপর সাহাবায়ে কেরাম ঘর নির্মাণ করেছিলেন, ক্ষেতখামার ও শিল্প-বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছিলেন।

সেই অনাবাদি জায়গা ছাড়াও আনসারী সাহাবাগণ রাসূল (সা.)-কে জায়গাজমি ও ঘরবাড়ি হাদিয়া হিসেবে দিয়েছিলেন। হযরত উম্মে আনস (রা.) রাসূল (সা.)-কে যে জমিজমা হাদিয়া দিয়েছিলেন তা তিনি হযরত উম্মে আইমনকে দান করে দিয়েছিলেন। অনুরূপ হযরত নোমান আনসারীও কিছু ঘরবাড়ি হাদিয়া দিয়েছিলেন।

হযরত আনস (রা.) থেকে বর্ণিত যে আনসারী সাহাবাদের মধ্যে কেউ কেউ খেজুর বাগানে নির্দিষ্ট খেজুরগাছ হাদিয়া দিয়েছিলেন। এরূপ বর্ণিত আছে যে এক ইয়াহুদি নওমুসলিম হযরত মুখাইরিক (রা.) নিজের সাতটি বাগান প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা.)-কে উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিলেন।

রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিগত মালিকানায় বনু নযীরের বিজিত জায়গাজমি ছিল এবং খাইবারের বিজিত বিশাল এলাকাও ছিল। (আনসাবুল আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৫১৮, ওয়াকেদী পৃ. ৩৭৭-৩৮০)

বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে রাসূল (সা.) প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য বার্ষিক ৮০ ওয়াসক খেজুর (১৬৯৮২.৪ কেজি) ও ২০ ওয়াসক (৪২৪৫.৬ কেজি) যব নির্ধারণ করেন। এসব নববী দানের হকদাররা শুধু ফসলের মালিক ছিলেন না বরং তাঁর জমিনেরও মালিক ছিলেন। তাই তো ওয়াফাতে নববীর পরে প্রায় উম্মাহাতুল মুমিনীন যাঁদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-ও ছিলেন নিজ অংশের ওপর মালিকানা তাসাররুফের অধিকার অর্জন করেছিলেন এবং তা বিক্রিও করেছিলেন। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল মুযারাআ, সীরতুন নবীর হাওয়ালায় খ. ২, পৃ. ৪৪০)

রাসূল (সা.) নিজ গৃহে খাওয়াদাওয়া ও পানাহারের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তার জন্য যত সামগ্রীর প্রয়োজন ছিল তারও ব্যবস্থা ছিল। এবিষয়ে বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থের কিতাবুল আতইমা ও আশরিবা তথা খাওয়াদাওয়া ও পানাহার অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনুরূপ রাসূল করীম (সা.) নিকটাত্মীয়দের জন্য তো খাদ্যের ব্যবস্থা করতেনই, সাথে দূরাত্মীয় ও সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন সময়ে খানার দাওয়াতও দিতেন এবং দূর-দূরান্ত থেকে যত মেহমান ও ডেলিগেশন আসতেন তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও রাসূল করতেন আর তার জন্য বেলাল (রা.) স্বতন্ত্র জিম্মাদার ছিলেন। বেশির ভাগের ব্যয় হুজুর (সা.) নিজেই বহন করতেন।

মাদানী যুগে রাসূল (সা.)-এর জীবনযাত্রা ও জীবিকা নির্বাহ : সারমর্ম : আরো অনেক দিক অনালোচিত রয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা রাসূল (সা.)-এর জীবিকা নির্বাহের একটি স্বচ্ছ রূপরেখা আমাদের সামনে ভেসে উঠেছে।

হিজরতের পরে শুরুর দিকে রাসূল (সা.)-এর জৈবনিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম ও উপায় ছিল আনসারী সাহাবায়ে কেরামের ও সম্পদশালী মুহাজের সাহাবায়ে কেরামের হাদিয়া-তোহফা ও উপহার-উপঢৌকন। এ সর্বোত্তম উসিলা ও উৎস স্বয়ং হুজুর (সা.) ও তাঁর সংশ্লিষ্ট পরিবার-পরিজনের তিন মৌলিক চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের পথ সৃষ্টি হয়েছে।

এটি ছিল রাসূল (সা.)-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম । শুধু এই মাধ্যমই ছিল তা নয়, বরং তার সাথে সাথে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদ, আযওয়াজে মুতাহহারাতের ধনদৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্যের পণ্য, সীমিতাকারে ক্ষেত-খামার, চতুষ্পদ জন্তু প্রতিপালন, সামান্য পরিসরের হস্তশিল্প ও গনিমতের মালদৌলতসহ আরো অনেক মাধ্যম ছিল। উপরোক্ত মাধ্যম থেকে যা পাওয়া যেত তা দিয়ে হুজুর (সা.) ও তাঁর পরিবার-পরিজন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি-সচ্ছলতার সাথে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আর জাগতিক সহায়-সম্পত্তিই যদি মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতো তবে উপরোক্ত উপায়-উপকরণ দিয়ে এত বেশি ধনদৌলতের মালিক হওয়া যেত, যার কল্পনা করাও দুষ্কর। রাসূল (সা.) দুনিয়াবী যিন্দেগী মান-সম্মান, সহজ-সরল ও অনাড়ম্বরতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। না সন্ন্যাসীদের মতো নিরামিষ জীবন যাপন করেছেন, না পুঁজিপতিদের মতো ভোগ-বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

রাসূল (সা.)-এর জীবনযাপন ছিল মূলত কোরআনে বর্ণিত ই'তেদাল তথা মধ্যপন্থার ওপর ভিত্তি। বাস্তবে রাসূল (সা.)-এর জীবনযাত্রা ছিল কনাআত (অল্পতুষ্টি) সবর (ধৈর্য) ও তাওয়াক্কুলের (ভরসা) মহাসড়কে চিরগতিশীল জীবনযাত্রা।

একনজরে সীরাতে সায়্যিদুল মুরসালীন

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়াসাল্লাম)

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

পবিত্র মীলাদ : সায়্যিদুনা ওয়া সায়্যিদুল মুরসালীনা ওয়ান নবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জন্ম হয় রবিউল আউয়াল মাস, সোমবার, আম্মুল ফিল (হস্তি বর্ষ) মোতাবেক ৫৭১ ঈসায়ী সনে। তাঁর জন্মের কয়েক মাস আগে পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। নিজের দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব'। মমতাময়ী মা হযরত আমেনার পক্ষ থেকে তাঁর নাম রাখা হয় 'আহমদ'। নিজ মাতা এবং আবু লাহাবের আযাদকৃত বাঁদী সুওয়াইবাহ (রা.) কিছুদিন তাঁকে দুগ্ধ পান করান। এরপর কুরাইশ বংশের ঐতিহ্য অনুযায়ী হযরত হালিমা সাদিয়া (রা.)-কে দুগ্ধপান ও লালনের জন্য দেওয়া হয়।

চার বছর বয়সে : শক্কে সদর তথা বক্ষ বিদীর্ণ করার ঘটনা সংঘটিত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, শক্কে সদরের ঘটনা চারবার সংঘটিত হয়েছে।

১. শৈশবে হযরত হালিমা সাদিয়ার কাছে থাকা অবস্থায়।

২. দশ বছর বয়সে (ফতহুল বারী ১৩/৪৮১)।

৩। নবুওয়াতপ্রাপ্তির সময় (মুসনাদে আবীদাউদ আততায়ালাসী ২১৫)।

৪। মে'রাজের সময়। (বুখারী শরীফ, হা. ৩৪৯)।

আরেক মতে পঞ্চমবার শক্কে সদরের কথাও উল্লেখ আছে, যা সহীহ মতানুসারে সাব্যস্ত নয়। (সীরাতে মুস্তফা ১/৭৫) রাসূল (সা.) প্রায় ছয় বছর হযরত হালিমা সাদিয়ার হাতে লালিত হন।

৬ বছর বয়সে : রাসূল (সা.)-এর মাতা হযরত আমেনার ইন্তেকাল হয়। আবওয়া নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। (শরহুল মাওয়াহেব লিয যারকানী ১/১৬০)

৭ বছর বয়স : থেকে তিনি দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে লালিত হন।

৮ বছর বয়সে : দাদার ইন্তেকাল হয়। এর পর থেকে চাচা আবু তালেবের হাতে লালিত হন। (তবকাতে ইবনে সাআদ ১/৭৪)

১২ বছর বয়সে : চাচার সাথে সিরিয়ার ব্যবসায়িক সফরের সঙ্গী হন। এই সফরে বুহাইরা রাহেব তাঁর নবুওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। (আল খাসায়েসুল কুবরা ১/৮৪)

মতান্তরে ১৪/১৫/২০ বছর বয়সে : আরবে ফুজার যুদ্ধের ঘটনা ঘটে। আপন কোনো কোনো চাচার পীড়াপীড়িতে এই যুদ্ধে রাসূল (সা.) অংশ নেন। কিন্তু কেতালে অংশগ্রহণ করেননি। (রাওজুল আনফ ১/১২০)

১৬ বছর বয়সে : মক্কাবাসীর (পাঁচ বংশীয় চুক্তি) হিলফুল ফুজুল নামের চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন।

২৫ বছর বয়সে : রাসূল (সা.) হযরত খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর করেন। এই সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর তাঁর সততা ও নিষ্ঠা এবং ব্যবসায়িক মুনাফা অবলোকন করে হযরত খাদিজা (রা.) রাসূল (সা.)-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। (তবকাতে ইবনে সাআদ ১/৮৩)

৩৫ বছর বয়সে : বাইতুল্লাহ শরীফের তৃতীয়বার সংস্কারের সময় হাজরে আসওয়াদকে নিজ হাতে স্থাপন করেন এবং এর মাধ্যমে পরস্পর যুদ্ধান্দেহী আরব গোত্রগুলোর মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। (সীরাতে ইবনে হেশাম ১/২৫)

৩৯ বছর বয়স পর্যন্ত নিজের এমন নজিরবিহীন সততা, নিষ্ঠা, কর্মতৎপরতা ও কীর্তি স্থাপন করেন, যার কারণে আপন-পর–সকলের মুখে তাঁর সততা ও নিষ্ঠার কথা উচ্চারিত হতে থাকে।

৪০ বছর বয়সে : তিনি বেশির ভাগ সময় হেরাগুহাতেই ব্যয় করেছেন। এখানেই তাঁকে নবুওয়াতের তাজ পরানো হয়।

নবুওয়াতের প্রথম বছর : তাঁর ওপর সূরায়ে আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (শরহুল মাওয়াহিব ১/২০৭) ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য হলো নবুওয়াত দান করা হয়েছে রবিবার। কিন্তু মাসের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন মত রয়েছে। ইবনে আব্দুল বার (রহ.)-এর মতে ৮ রবিউল আউয়াল তাঁকে নবুওয়াতের তাজ পরানো হয়। এই মতানুযায়ী নবুওয়াতপ্রাপ্তির সময় তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। কিন্তু ইবনে ইসহাকের মত হলো তাঁকে ১৭ রমাযান নবুওয়াত দানে ভূষিত করা হয়। এই মতানুযায়ী তখন তাঁর বয়স হয় চল্লিশ বছর ছয় মাস। হযরত ইবনে হাজার আসকলানী (রহ.) এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (ফতহুল বারী ১২/৩১৩)

নবুওয়াতের দ্বিতীয় বছর : রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোপনে তাবলীগে দ্বীনের কাজ শুরু করেন। এই বছরই হযরত খাদিজা (রা.), হযরত ওয়ারাকা ইবনে নাওফল (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত আফীফ কিন্দী (রা.), হযরত তলহা (রা.), হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ

(রা.), হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.), হযরত আম্মার (রা.), হযরত সুহাইব (রা.), হযরত আমর ইবনে আ'বাসা (রা.) এবং হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) ঈমান আনয়ন করেন। এ সকল মহান ব্যক্তিসহ আরো কয়েকজন সাহাবীকে সাবেকীনে আওয়ালীন তথা সর্বপ্রথম সাহাবী বলা হয়।

নবুওয়াতের তৃতীয় বছর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর লালিত সন্তান হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার পুত্র হযরত উসামার জন্ম হয়।

নবুওয়াতের চতুর্থ বছর : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ আসে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলে আরব গোত্র বিশেষ করে কুরাইশরা প্রকাশ্য দুশমনী ও বৈরিতায় মেতে ওঠে।

নবুওয়াতের পঞ্চম বছর : হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এই বছরই হাবশার প্রতি প্রথম এবং দ্বিতীয় হিজরত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম হিজরতে ১১জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। (ফতহুল বারী ১/১৮০) দ্বিতীয় হিজরতে ৮৬ জন পুরুষ এবং ১৬ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১১১) এই বছরই আবু জেহেলের হাতে হযরত সুমায়্যা (রা.) শহীদ হন। ইসলামের জন্য নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম শহীদ।

নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর : হযরত হামজা (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদেরকে নিয়ে মসজিদে হারামে প্রকাশ্যে নামায আদায় করা হয়। (শরহুল মাওয়াহেব ১/২৭৬)

নবুওয়াতের সপ্তম বছর : মুকাত'আয়ে কুরাইশের তথা স্যোসাল বয়কাটের ঘটনা ঘটে। রাসূল (সা.)-এর সাথে বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিবকে শু'আবে আবী তালেবে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। এই অবস্থাতেই রাসূল (সা.)- এর চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জন্ম হয়। (রওজুল আনফ ১/২৩২)

নবুওয়াতের অষ্টম বছর : মুশরীকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শক্কে কমর তথা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অকল্পনীয় মুজিযা প্রকাশ পায়। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/১১৮)

নবুওয়াতের দশম বছর : মুকাতাআ সমাপ্ত হয়। (তবকাতে ইবনে সাআদ ১/১৩৯) এ বছরই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা আবু তালেব ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের প্রায় ৩ থেকে ৫ দিন পর হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বছরকে আম্মুল হুজন তথা পেরেশানির বছর হিসেবে আখ্যায়িত করেন। (শরহুল মাওয়াহেব ১/২৯১) এ বছরই হযরত সাওদা বিনতে যুমআর সাথে রাসূল (সা.)-এর শাদি মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর হযরত আয়েশা (রা.)ও তাঁর আকদে নেকাহে আসেন। কিন্তু রুখসতী হয়নি। এই বছর তায়েফের হৃদয়বিদারক ঘটনাও ঘটে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

নবুওয়াতের একাদশ বছর : মদীনা থেকে আগত হাজীদের মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাওয়াতে প্রায় ৬ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে আনসারদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ধারা আরম্ভ হয়। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/১৪৮)

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছর : রাসূল (সা.)-এর ঐতিহাসিক মে'রাজ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উম্মতের ওপর ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। এ বছরই বাইআতে উকবায়ে উলা সংঘটিত হয়। এতে ১২ জন ইসলাম গ্রহণ করেন। (শরহুল মুওয়াহেব ১/৩১৬)

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর : বাইআতে উকবায়ে ছানিয়া অনুষ্ঠিত হয়। যাতে ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বছরই মুসলমানরা মদীনা হিজরতের অনুমতি পান। এ বছরই কুরাইশরা (নাউজু বিল্লাহ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এখান থেকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করেছেন। অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন।

রাসূল (সা.)-এর মাদানী জিন্দেগী : হিজরতের পরের সময়কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাদানী যিন্দেগী বলা হয়। যা ছিল অত্যন্ত গৌরবদীপ্ত সময়। এ সময়গুলোতে রাসূল (সা.)-এর অক্লান্ত মেহনত, চেষ্টা কুশেশ এবং আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়কেতন হস্তগত হয়।

হিজরী প্রথম বর্ষ : রাসূল (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে তিন দিন সওর গুহায় আত্মগোপন করার পর ১ রবিউল আউয়াল মদীনার দিকে হিজরত করেন। ইসলামের প্রথম মসজিদ মসজিদে কুবা প্রতিষ্ঠা করেন। মদীনার ইহুদি এবং প্রতিবেশী গোত্রগুলোর মধ্যে নিরাপত্তা ও সম্প্রীতির চুক্তিনামা লেখানো হয়। এ বছর হযরত সালমান ফারেসী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। মসজিদে নববীও প্রতিষ্ঠা করেন এই বছর। আযান ও ইকামতও এ বছর

আরম্ভ হয়। আনসার এবং মুহাজেরদের মধ্যে এমন ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়, যার উপমা দুনিয়ায় বিরল। এই বছর শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রুখসতী হয়।

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষ : মুসলমানদের ওপর জিহাদ ফরয করা হয়। রমাযানের রোযা, সদকাতুল ফিতর এবং দুই ঈদের নামাযের বিধান জারি হয়। মসজিদে আকসার পরিবর্তে বাইতুল্লাহ মুসলমানদের কিবলা হিসেবে নির্ধারিত হয়। হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। রাসূল (সা.)-এর নয়নমণি হযরত রুকায়্যা (রা.) ইন্তেকাল করেন এই বছর। হক্ব বাতিলের প্রথম জিহাদ বদর যুদ্ধও সংঘটিত হয় এ বছর।

হিজরী তৃতীয় বর্ষ : রাসূল (সা.)-এর সাথে হযরত হাফসা বিনতে উমর ফারুক (রা.) এবং হযরত যায়নব বিনতে খুযাইমার শাদি মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উম্মে কুলসুমের সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর শাদি হয়। রাসূল (সা.)-কে কটাক্ষকারী কাআব ইবনে আশরাফ এবং আবু রাফেকে হত্যা করা হয় এবং উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

হিজরী চতুর্থ বর্ষ : কুরাইজা গোত্রকে নির্বাসন করা হয়। হযরত হুসাইন (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল (সা.)-এর সাথে হযরত উম্মে সালামার সাথে শাদি হয়। এ বছর শরাব-মদ হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হয়।

হিজরী পঞ্চম বর্ষ : শরয়ী পর্দার হুকুম নাযিল হয়, যেনার সাজার হুকুম অবতীর্ণ হয়। সালাতুল খওফ শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত হয়। তায়াম্মুমের অনুমতি আসে। ইফকের ঘটনা ঘটে। হযরত আয়েশা (রা.) শানে পবিত্র কোরআনের সূরায়ে নূর নাযিল হয়। রাসূল (সা.)-এর সাথে হযরত জুয়াইরিয়া ইবনে হারেছ এবং হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর শাদি হয়। খন্দক যুদ্ধ, গাজওয়ায়ে বনী মুস্তালাক, গজওয়ায়ে বীরে মাউনা ইত্যাদি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বীরে মউনার যুদ্ধে ৭০ জন হাফেজ সাহাবী (রা.) শহীদ হন।

হিজরী ষষ্ঠ বর্ষ : সম্পদশালী মুসলমানদের ওপর হজ ফরয হয়। সূরা ফতাহ নাযিল হয়। এ বছরই হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠিত হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ১৪০০ সাহাবায়ে কেরাম উমরার জন্য মক্কার দিকে রওনা হন। হুদাইবিয়া সন্ধির পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যান্য দেশের বাদশাহদের প্রতি দাওয়াতি পত্র প্রেরণ করেন। এ বছরই মদীনাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যা রাসূল (সা.)-এর দু'আর বরকতে কেটে যায়।

হিজরী সপ্তম বর্ষ : খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় লাইলাতুত তারীসের ঘটনা ঘটে। এ সময় পুরো সেনাদলের ফজরের নামায কাজা হয়ে যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এক ইহুদি নারী যায়নব বিনতে হারেছ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খাদ্যে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হযরত উম্মে হাবীবা রমলা বিনতে আবী সুফিয়ান, হযরত মায়মুনা বিনতে হারেছ এবং হযরত সফিয়্যা (রা.)-এর শাদি হয়। হযরত সফিয়্যা (রা.) রাসূল (সা.)-এর সর্বশেষ স্ত্রী।

হিজরী অষ্টম বর্ষ : হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) এবং আমর ইবনুল আস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উমরাতুল কাজা পালন করেন। মুতা যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটে। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। হুনাইন এবং তায়েফ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই বছর রাসূল (সা.)-এর সাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।

হিজরী নবম বর্ষ : তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মোনাফেকদের নির্মিত মসজিদে জেরার ধ্বংস করা হয়। রইসুল মুনাফিকীন আব্দুল্লাহ বিন সলুল নিহত হয়। এ বছর ৭০-এর অধিক প্রতিনিধিদল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। সূরায়ে তাওবা নাযিল হয়। এই বছর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপন বিবিদের সঙ্গে ঈলা করেন। কসম করেন এক মাস তাঁদের সংস্পর্শে যাবেন না। এই বছর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোড়া থেকে পতিত হন। যার কারণে ডান বাহু এবং গোড়ালিতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এই বছর হজ ফরয হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে আমীর করে তিন শত সদস্যের একটি দল হজের জন্য রওনা করা হয়।

হিজরী দশম বর্ষ: মুসাইলামাতুল কাযযাব এবং আসওয়াদে আনসী নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বিদায় হজে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। এতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিবিগণসহ এক লক্ষেরও বেশি সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। ইসলামের সমস্ত বিধানাবলি বুঝিয়ে দেওয়া হয়। জাহিলিয়্যাত এবং শিরকী সকল বিষয়কে মিটিয়ে দেওয়া হয়। উম্মতকে আল বিদা বলে মুসলিম উম্মাহ বরং পুরো দুনিয়াকে এতীম বানিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর সান্নিধ্যে তাশরীফ নিয়ে যান। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়াসাল্লাম।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা : আব্দুল হামিদ
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

জিজ্ঞাসা :

ক. ইমাম সাহেব ভুলে শেষ বৈঠক না করে পঞ্চম রাক'আতের রুকু-সিজদা আদায় করে বৈঠক এবং সিজদায়ে সাহু করে নামায শেষ করেন। এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত নামায দ্বারা ফরজিয়াত আদায় হয়েছে কি না? খ. ইমাম সাহেব শেষ বৈঠক না করে কী পরিমাণ দাঁড়ালে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

সমাধান :

ক. প্রশ্নোক্ত অবস্থায় শেষ বৈঠক না করার কারণে উক্ত নামায সহীহ হয়নি পুনরায় পড়তে হবে। (আদদুররুল মুখতার-২/৮৫, হিদায়া-১/১৫৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-২/১৭৭)

খ. শেষ বৈঠক না করে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে গেলে বা দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয়ে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। (আদ দুররুল মুখতার-২/৮৫)

প্রসঙ্গ : কসম

মুহা : মিযানুর রহমান
মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা :

আমার মামা তাঁর ছেলেকে বললেন, তুমি আমার ছেলে না। যদি আমি তোমাকে ছেলে দাবি করি তাহলে আমি মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে যাব এবং তোমার রুজি-রোজগার খাওয়া আমার জন্য হারাম হয়ে যাবে। এখন আমার জানার বিষয় হলো, ওই সমস্ত কথা বলার পরে যদি তিনি তাঁর ছেলেকে দাবি করেন এবং রুজি-রোজগার ভক্ষণ করেন তাহলে তাঁর জন্য করণীয় কী? এবং কসম না করলে তাঁর হুকুম কী?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে নিজের ঔরসে যে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তা জন্মদাতা পিতার সন্তান হিসেবেই গণ্য হয় তাকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তাই সর্বাবস্থায় সে আপনার মামার ছেলে হিসেবেই থাকবে। কোরআন-সুন্নাহর বর্ণনা অনুযায়ী সন্তানের রুজি-রোজগারকে পবিত্র ও হালাল রিজিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই পিতার জন্য সন্তানের কামাই খাওয়া সম্পূর্ণ হালাল, তবে আপনার মামার এ ধরনের উক্তি করার দ্বারা তা কসমে পরিণত হয়ে গেছে, তাই পরবর্তীতে ছেলের কামাই খেয়ে কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দেবে। উল্লেখ্য যে এ-জাতীয় কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। (সূরা তাহরীম-১, মুসলিম শরীফ-২/৪৮, মুসনাদে আহমদ-৬/২৩২)

প্রসঙ্গ : ইমামত

মাও. ফজলুল্লাহ
ইমাম ও খতীব মাহমুদিয়া জামে মসজিদ উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করে দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ ঢাকায় ইমামতি করে আসছি। বর্তমানে আমি উত্তর বাড্ডাস্থ মাহমুদিয়া জামে মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করতেছি। ইমামতির পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজে শিক্ষকতা করি। উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চলে আসছে। আমার মেইন দায়িত্ব হলো শিক্ষা বোর্ডসংক্রান্ত বিষয়গুলোর তদারকি করা। পাশাপাশি প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারি সেকশনে ছোট ছোট অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের ক্লাসে পাঠদান করা। উল্লেখ্য যে দায়িত্ব পালনকালে মহিলা শিক্ষিকাদের সাথে আমার উঠাবসা নেই। এমতাবস্থায় আমার পেছনে সাধারণ মুসল্লিদের ইক্তিদা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা আছে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েরা যদি এত ছোট হয় যে, তাদের দিকে তাকালে কামভাবের উদ্রেক হয় না এবং মহিলা শিক্ষিকাদের সাথে পরিপূর্ণরূপে শরয়ী পর্দা রক্ষা করে চলা হয় তাহলে আপনার পেছনে সাধারণ মুসল্লিদের ইক্তিদা করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বাধা নেই। তবে যেহেতু ইমাম সাহেব এ ধরনের পেশা অবলম্বন করলে মুসল্লিদের কু-ধারণা হতে পারে তাই আপনার জন্য উক্ত পেশা পরিহার করাটাই শ্রেয়। (রদ্দুল মুহতার-৬/৩৬৫, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া- ৪/৩৭১)

প্রসঙ্গ : বিবাহ/তালাক

তারিফ ইমাম
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

১. স্ত্রীকে তালাক (সম্পূর্ণভাবে) দেওয়ার পর স্ত্রীর কাবিননামার অর্থ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করে দিয়ে আইনগত এবং ইসলামিকভাবে ডিভোর্স দিয়ে দেওয়ার পর আবার পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক। আমরা উভয়ে আমাদের ডিভোর্স হওয়ার পর কিন্তু অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইনি। আমরা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কী করণীয়? ২. আমার অভিভাবক এবং তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর অভিভাবক আমাদের পূর্ববর্তী বিবাহ এবং বর্তমান সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট। এ ক্ষেত্রে আমাদের ওপর কি কোনোরূপে বদ দু'আ পড়তে পারে?

সমাধান :

১. প্রশ্ন এবং সংযুক্ত তালাকের নোটিশের বর্ণনা অনুযায়ী আপনি যখন তাকে তিন তালাক দিয়েছেন, সাথে সাথেই তা কার্যকর হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে উক্ত স্ত্রী আপনার জন্য হারাম হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে এর সঠিক পদ্ধতি কোনো বিজ্ঞ মুফতী সাহেব থেকে মৌখিকভাবে জেনে নেবেন। (সূরা বাকারা-২৩, রদ্দুল মুহতার-২/৩৩)

২. যথাসম্ভব অভিভাবকদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেন এবং শরীয়ত অনুযায়ী তাদের দেওয়া সিদ্ধান্ত মেনে চলেন। অন্যথায় তাদের বদ দু'আ পড়তে পারে। (সূরা লুকমান-২৫, মা'আরিফুল কুরআন-৫/৪৫২)

প্রসঙ্গ : সুদি ব্যবসা

মুহা: ওমর ফারুক
কুড়িল চৌরাস্তা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি একটি ব্যবসা করতে চাই আর এই ব্যবসাটি করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন, যা আমার পক্ষে জোগান দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ব্যাংকের শরণাপন্ন হতে হয়। প্রাইভেট ব্যাংক থেকে সরকারি ব্যাংকে বেশি ব্যবসায়িক সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে কিছু কমিশন দিতে হয় কমিশন না দিলে তারা গড়িমসি করে। তাই আমি জানতে চাই, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করা এবং কমিশন দিয়ে ঋণ নেওয়া শরীয়তে বৈধ আছে কি না? এবং এই ব্যবসাটি আমি এবং আমার এক বন্ধু মিলে করতে চাই। এ ব্যাপারে ইস্তেখারাও করা হয়েছে, ইস্তেখারায় দুজন বিশেষ আলেমকে স্বপ্নে দেখা গেছে এর দ্বারা কী বোঝায়।

সমাধান :

সুদের ওপর ঋণ নেওয়া সর্বাবস্থায় হারাম এবং মারাত্মক গোনাহ। তাই ব্যাংক থেকে সুদের ওপর ঋণ নিয়ে এবং এর জন্য কমিশন তথা ঘুষ দিয়ে ব্যবসা করার অনুমোদন শরীয়তে নেই। তবে আপনার যদি পুঁজির প্রয়োজন হয় তাহলে কোনো অর্থবান লোককে আপনাদের ব্যবসায় শরিক করতে পারেন অথবা আপনার পুঁজি অনুপাতে ছোটখাটো কোনো ব্যবসা করতে পারেন। আলোচ্য বিষয়ের ইস্তেখারায় দুজন বিশেষ আলেমকে স্বপ্ন দেখার অর্থ হলো আপনাদের পরিকল্পনার বিষয়টিতে একক সিদ্ধান্ত না নেওয়া। বরং তা কোনো অভিজ্ঞ মুফতী সাহেবের ফতওয়ার ওপর ন্যস্ত করা। (সূরা মায়েদা-২, মুসলিম শরীফ-২/২৭, রদ্দুল মুহতার- ৫/১১১)

প্রসঙ্গ : দাড়ি

মাও. বেলাল
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

জিজ্ঞাসা :

ইসলামী শরীয়তে দাড়ি কতটুকু লম্বা হওয়া আবশ্যক। যদি মসজিদের ইমাম সাহেবের দাড়ি ছাঁটা হয় তাহলে তাঁর পেছনে নামায পড়ার হুকুম কী? এবং উক্ত মসজিদের মহল্লাবাসীর করণীয় কী?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে দাড়ি কমপক্ষে একমুষ্টি পরিমাণ লম্বা রাখা ওয়াজিব। তাই যে ইমাম সাহেব দাড়ি ছাঁটে তাঁর পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমি তথা নাজায়েয। তাই তাওবা করে দাড়ি ঠিক না করলে এমন ইমাম সাহেবকে বাদ দিয়ে দ্বীনদার ও উপযুক্ত ইমাম নিয়োগ দেওয়া মসজিদ কমিটি ও মহল্লাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে। (বুখারী শরীফ-২/৮৭৫, রদ্দুল মুহতার-২/৪০৭, আপকে মাসায়েল আউর উনকা হল-৩/৪৪৮)

প্রসঙ্গ : ইসলামী ব্যাংকে চাকরি

মুহা: আব্দুল্লাহ আল মামুন
মধুমিতা রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

সম্প্রতি আমি পড়ালেখা শেষ করেছি, জনাবের নিকট আমার আবেদন এই যে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে চাকরি করা শরীয়াহ মোতাবেক হবে কি না? এ ব্যাপারে আপনার সহীহ পরামর্শ কামনা করছি।

সমাধান :

যেহেতু আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক সুদমুক্ত লেনদেনের দাবি করে এবং অভিজ্ঞ শরীয়াহ বোর্ড তার নেগরানী করে বিধায় তাদের দাবির বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হলে ওই ব্যাংকে চাকরি করাকে নাজায়েয বলা যাবে না। (সূরা মাইদা-২, ফাতহুল মুলহিম-১/৬১৯, আল মসদরুস সাবেক-১/৫৭৫)

প্রসঙ্গ : সুদি লেনদেন

মুহা: মিজানুর রহমান
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমানে ব্যাংক বিত্তশালীদের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যাংকের অবদান অনস্বীকার্য। যারা বড় ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা গার্মেন্ট ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট হারে সুদের ওপর লোন নিয়েই তা করছে, এমনকি হাউজ বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে, আর তা ছাড়া উপায়ও নেই। কেননা লোন না নিয়ে নিজস্ব অর্থে বিল্ডিং করতে গেলে সরকারের পক্ষ থেকে বড় ধরনের কর চাপানো হয়। আবার কারো পক্ষে এত বিপুল অর্থের জোগান দেওয়াও সম্ভব নয়। তাই তারা ঠিকই ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছে এবং নিজ নিজ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান চালু করছে। এখন আমার জানার বিষয় হলো, এভাবে ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট হারে সুদের ওপর লোন নিয়ে ব্যবসা করা এবং এর দ্বারা অর্জিত প্রফিট বা লাভের হুকুম কী? আর যদি ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার কোনো বৈধ পদ্ধতি থাকে তাহলে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

সুদ দেওয়া ও নেওয়া উভয়টি হারাম তাই সুদি ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট হারে সুদের ওপর লোন নিয়ে ব্যবসা করার অনুমতি নেই। প্রয়োজনে বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলো থেকে মুদারাবা বা মুরাবাহ বা শিরকত বা অন্য কোনো শরয়ী পদ্ধতিতে অর্থ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। তবে সুদের ওপর লোন নেওয়ার লেনদেন হারাম হলেও এর দ্বারা ব্যবসা করে অর্জিত প্রফিট বা লাভ হারাম নয় বরং হালাল, সর্বাবস্থায় হারাম লেনদেনের কারণে যে গোনাহ হয়েছে তা থেকে তাওবা আবশ্যক। (সূরা বাকারা-২৭৫, বুখারী শরীফ-১/২৮০, মুসলিম শরীফ-২/১৮৬)

প্রসঙ্গ : সন্তান পরিবর্তন

মুছা : মর্জিনা বেগম
গুরুদাসপুর, নাটোর।

জিজ্ঞাসা :

আমরা দুই খালাতো বোন। একজনের ছেলে অপরজনের মেয়ে দ্বারা পরিবর্তন করি। এর কারণ আমার কোনো মেয়ে নেই আর তার কোনো ছেলে নেই। এই সন্তান পরিবর্তনে আমি রাজি ছিলাম না। শুধু আমার স্বামী বলে যে আমার একটা মেয়ে চাই। তাই আমি আমার স্বামীকে খুশি রাখার জন্য এই শর্তে আমার ছেলেকে তাদের মেয়ের পরিবর্তে দেই যে, আমার ছেলেকে মাদ্রাসায় পড়াতে হবে। কেননা আমার বাকি দুই ছেলে মাদ্রাসায় পড়ে হাফেজ হচ্ছে। আর তারাও এই শর্ত মেনে নিয়ে মাদ্রাসায় পড়ানোর ওয়াদা দিয়েছিল। এখন আমার ওই ছেলের বয়স প্রায় সাত-আট বছর। কিন্তু তারা এখনো তাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করেনি। তাদেরকে ভর্তির কথা বললে তারা বিভিন্ন অজুহাত দেখায় যেমন বলে এখনো তার বয়স হয়নি। এখন আমার জানার বিষয় হলো, আমরা যে পরিবর্তনটা করেছি তা শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? আর আমার ছেলেকে যে শর্তে তাদেরকে দিয়েছি তারা যদি সেই শর্ত পুরা না করে, অর্থাৎ মাদ্রাসায় না পড়ায় তাহলে তাকে আমরা ফিরিয়ে নিতে পারব কি না?

সমাধান :

পর সন্তানকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে তার সাথে সন্তানের মতো আচরণ (যেমন মৃত্যুর পর নিজ সন্তানের ন্যায় সেও সম্পদের একটি অংশের মালিক হওয়া এবং তাকে মাহরাম মনে করা ইত্যাদি) ইসলাম পূর্ব আইয়ামে জাহেলিয়্যাতের একটি প্রথা। ইসলামী শরীয়ত সেই প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বিধায় তা নাজায়েয। তবে সন্তান হিসেবে গ্রহণ না করে বা পরস্পরে সন্তানের পরিবর্তন না করে শুধু লালন-পালনের উদ্দেশ্যে খরচাদি বহন করা বা তার দেখাশোনা করার অনুমতি আছে। আর আপনি আপনার খালাতো বোনের সাথে সন্তান পরিবর্তন করার দ্বারা আপনার সন্তান তার হয়ে যায়নি। তাই তাকে ফেরত নিতে পারেন। (সূরা আহযাব-৪-৫, বুখারী শরীফ-১/৪৯৮, কেফায়াতুল মুফতী-৫/২৭৭)

প্রসঙ্গ : ইজারা

মুহা: মাহমুদ হাসান
টেকনাফ, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক ব্যক্তির মালিকানা জমিতে প্রতিবছর কানিপ্রতি লবণ উৎপাদিত হয় ২০০ থেকে ২২০ মণ করে। প্রত্যেক মৌসুমে চাষিদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে মূল উৎপাদনের নির্দিষ্ট শতাংশ অথবা শ্রমিক হিসেবে বেতন ঠিক করে চুক্তি হয়। অনেক সময় চাষিদের অবহেলায় মালিকের দেওয়া উৎপাদন সরঞ্জাম চুরি হয়ে অথবা উৎপাদিত লবণ থেকে চুরি হওয়ায় মালিককে এর লোকসান গুনতে হয়। এ বছর এই মর্মে চুক্তি হয় যে উৎপাদনের সরঞ্জাম চাষিদের আর চাষিরা কানিপ্রতি মালিক কে ১০০ মণ করে লবণ দেবে, বাদবাকি লবণ পাবে চাষিরা। হুজুর সমীপে প্রশ্ন হলো, এই রূপ চুক্তি শরীয়তসম্মত কি না? যদি না হয় মৌসুমের মাঝ পথে এসে মালিকের করণীয় কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

ইজারা দেওয়া জমির উৎপাদিত লবণ থেকে লবণ দেওয়ার শর্ত না করলে প্রশ্নে বর্ণিত চুক্তি শরীয়তসম্মত। (ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম-১৫/২৫৬, আল ফিকহুল হানফি ওআদিল্লাতুহু-২/৭৪)

প্রসঙ্গ : তালাক

মুহা: আব্দুস সাত্তার
বসুন্ধরা আর/এ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার স্ত্রীকে পারিবারিক ঝগড়াঝাঁটির একপর্যায়ে প্রচণ্ড রাগের মাথায় এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বলেছি, যা উপস্থিত লোকজন শ্রবণ করেছে এবং পরবর্তীতে আমাকে বলেছে যে আপনি তাকে তিন তালাক দিয়েছেন তবে তাৎক্ষণিকভাবে আমি তাকে কয় তালাক দিয়েছি তা প্রচণ্ড রাগের কারণে আমার স্মরণ নেই। উল্লিখিত পরিস্থিতিতে তালাক পতিত হবে কি না? এবং আমার করণীয় কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

তালাক আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। সামাজিকভাবেও তা নিন্দনীয়, স্ত্রীকে কথায় কথায় তালাক দেওয়া বিশেষত একসাথে তিন তালাক দেওয়া মারাত্মক গোনাহ এবং নারী নির্যাতনের শামিল। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ ধরনের লোকদের শাস্তির বিধান থাকা উচিত। এতদসত্ত্বেও কেউ নিজ স্ত্রীকে উদ্দেশ করে স্বাভাবিক বা রাগান্বিত অবস্থায় স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে ভিন্নভাবে বা একসাথে তিন তালাক উচ্চারণ করলে ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তা স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে স্ত্রী স্বামীর জন্য সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে যায়। তাই প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী আপনার স্ত্রীর ওপর তিন তালাক পতিত হয়ে সে আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। এখন তার সাথে পুনরায় ঘর-সংসার করতে চাইলে তার সঠিক পদ্ধতি কোনো বিজ্ঞ আলেম থেকে মৌখিকভাবে জেনে নেবেন। (ফাতাওয়াযে কাজীখাঁ-২/২১১, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/৩৫৬, আবু দাউদ শরীফ-১/২৯৬)

প্রসঙ্গ : কবরস্থান

হাজী মুহা: ইসমাঈল হোসেন
পশ্চিম ভাসানটেক, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় ব্যক্তিমালিকানাধীন একটি কবরস্থান আছে। যার মাঝে একটি সারি নিজের পরিবারের জন্য সংরক্ষিত রেখে বাকি জায়গা সংশ্লিষ্ট মহল্লার বাসিন্দাদের জন্য তিনি দান করেছেন। এই কবরস্থান দেখাশোনার জন্য একটি কমিটি রয়েছে। কমিটি দাতার সম্মতিতে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কবর দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সদস্যপদ গ্রহণ ও কবরস্থান উন্নয়নকল্পে একটি নির্ধারিত ফি ধার্য করে। যা দ্বারা মাটি ভরাট, দেয়াল নির্মাণ ইত্যাদি কাজ করা হয়। বর্তমানে কবরস্থানটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কবরস্থানের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার পর কিছু টাকা অলস পড়ে আছে। উল্লিখিত কবরস্থানে খরচ করার আর প্রয়োজন নেই। এবং প্রয়োজন হলেও খরচের ব্যবস্থা আছে। জনাবের নিকট আরজ হলো উক্ত কবরস্থান মহল্লায় একটি এতিমখানা-মাদ্রাসা হতে যাচ্ছে। আর্থিক দুরবস্থার কারণে কাজ করা যাচেছ না। সুতরাং কবরস্থানের জমিদাতা ও পরিচালনা কমিটি চাইলে উক্ত টাকা এতিমখানার নির্মাণকাজে ব্যবহার করতে পারবে কি না? জানালে উপকৃত হব।

সমাধান :

কবরস্থানের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরও যদি অতিরিক্ত টাকা বাকি থাকে এবং তা ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হবে না বলে মনে হয়, তবে তা দাতাদের সম্মতিতে এতিমখানা-মাদ্রাসার নির্মাণকাজে ব্যবহার করা যাবে। (আদদুররুল মুখতার-৪/৪২২, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-২/৪৭৭, ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১৫/৩০৬)

প্রসঙ্গ : তায়াম্মুম

মুহা: আবুল কাসেম
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

আমি অনেক দিন যাবৎ ঠাণ্ডা, অ্যালার্জি এবং শ্বাসকষ্ট ব্যাধিতে আক্রান্ত, এ জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। তন্মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে গোসল করা (তথা দুপুরবেলা গোসল করা) নিয়মের বহির্ভূত সময়ে গোসল করার দ্বারা শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। যার দরুন আমাকে পুরো দিন কষ্ট পোহাতে হয়। এখন আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত সমস্যার কারণে ভোররাতে ফরয গোসল থেকে বিরত থেকে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করতে পারব কি না? ভোররাতের জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি থাকলে দুপুরবেলা গোসল করতে হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির জন্য যদি গরম পানি ব্যবহারও ক্ষতিকর হয় অথবা তার ব্যবস্থা না হয় তাহলে তার জন্য ভোররাতে গোসল না করে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা জায়েয হবে তবে দুপুরবেলা উক্ত সমস্যা না থাকলে গোসল করতে হবে। (আবু দাউদ শরীফ-১/৪৮, হিদায়াহ-১/৮৬, ফাতাওয়ায়ে রহিমীয়া-৪/২৬৫)